ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব

পিনাকী ভট্টাচার্য

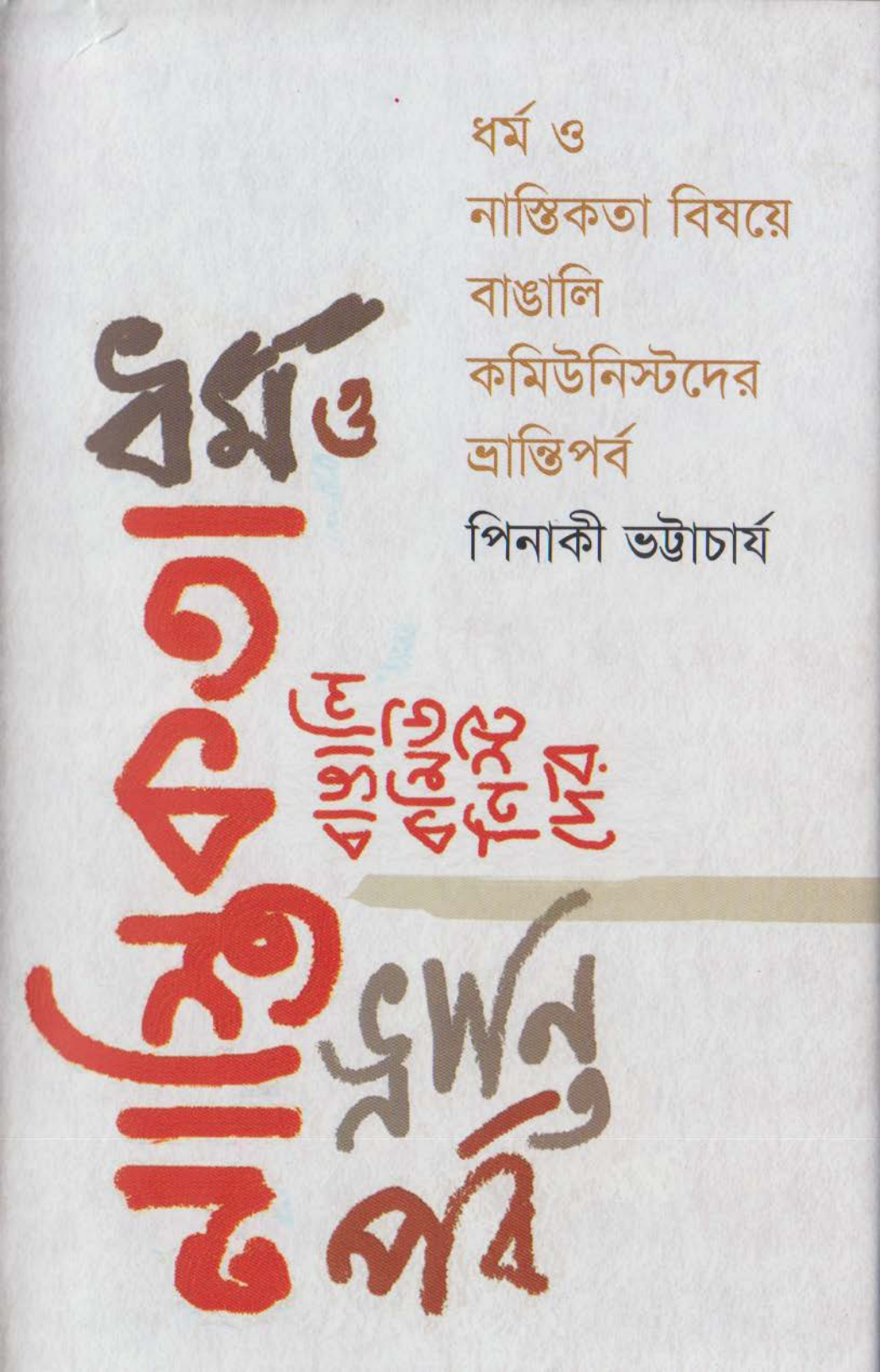

ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে
বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব

পিনাকী ভট্টাচার্য

ভাষাচিত্র

www.pathagar.com

ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে
বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব

পিনাকী ভট্টাচার্য

প্রকাশক
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
ভাষাচিত্র ৫০/১ পুরানা পল্টন লাইন, ২য় তলা
ঢাকা ১০০০, মুঠোফোন : ০১৯৬৭ ৪০৪০৪০, ০১৬১১ ৩২৪৬৪৪
প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৬
স্বত্ব লেখক
প্রচ্ছদ রিফাত হাসান
মুদ্রণ টিমওয়ার্ক
মূল্য ১৫০ টাকা

DHORMO O NASTIKOTA BISHOYE BANGALI COMMUNISTDER BHRANTIPORBO
by Pinaki Bhattacharya
First Published : February 2016
Published by **BHASHACHITRA**
50/1 Purana Paltan Line, 1st Floor, Dhaka 1000
Cell : 01967 404040, 01611 324 644

E-mail : bhashachitra@gmail.com

PRICE : TK 150 US $ 9

ISBN : 978-984-92082-9-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ফরহাদ মজহার
শ্রদ্ধাবরেষু

যাঁর লেখাতেই মার্ক্সকে নতুনভাবে
পাঠ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ফেসবুকে একটা বিতর্ক থেকে এই লেখার সূত্রপাত। পশ্চিমবঙ্গের একজন ফেসবুক বন্ধু দাবি করে বসেছিলেন, "নাস্তিক না হলে বস্তুবাদী হওয়া যায় না আর বস্তুবাদী না হলে বিপ্লব করা যায় না।" এই অদ্ভুত কথা শুনে প্রতীতি হলো সম্ভবত বিপ্লব, বস্তুবাদ আর নাস্তিকতা নিয়ে বাঙালি বামপন্থীদের চিন্তার ক্ষেত্র এতটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে সেটার উপর থেকে ধুলাবালির আবর্জনা সরানোর কাজটা শুরু করা জরুরি। এ বিষয়ে ফরহাদ মজহার তাঁর 'মোকাবিলা' গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছেন, তার সূত্র ধরেই আলাপটা ফেসবুকে আরম্ভ হয়েছিল। নাস্তিকতা যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাসঙ্গিক বিষয় নয় সেটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেই বিতর্কে।

এর পরে নানা প্রশ্ন আর তর্কে আলাপের গতিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রসঙ্গের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই প্রশ্ন ও প্রসঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে আলাপের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই গ্রামসি এসেছে, ধর্ম প্রসঙ্গে গ্রামসির চিন্তাও ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই লেখাগুলিকেই সংকলিত করে বর্তমান বইয়ের রূপ দেয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থে ফরহাদ মজহারের 'মোকাবিলা' বইটি থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক আলাপ লেখকের অনুমতি নিয়েই কিছু স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্লিষ্ট মনে হবে এজন্য লেখার মধ্যে রেফারেন্স দেয়া হয়নি। আর মার্ক্সের যে রচনাগুলো Marxist.org থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলোরও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এগুলো বুঝে নিতে পারবেন।

বাংলার বামপন্থী আন্দোলনে এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুরু হোক এটাই কামনা।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা

পিনাকী ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঠসূচি

ধর্ম, নাস্তিকতা, পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ ১১
ধর্মের বিপ্লবী চরিত্র ১৮
প্রাচ্যের ইতিহাস কেন সব সময় ধর্মের ইতিহাস হিসেবে হাজির হয়? ২১
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে হলেই কি নাস্তিক হতে হবে? ২৫
মার্ক্সবাদ কোন্ বস্তুবাদ? ৩১
মার্ক্স-এর 'আফিম' : এর আগে-পরে কি কিছু ছিল? ৩৫
শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি ৪০
মার্ক্স-লেনিন ধর্ম বিষয়ে কী বলেছিলেন আর অনুবাদে কী হয়েছে ৪৫
ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে মার্ক্স ৫০
বুখারিনের ভ্রান্ত মার্ক্সবাদ পাঠ এবং গ্রামসি'র ব্যাখ্যা ৫৩
ধর্মের সাথে বাঙলায় রাজনৈতিক ফয়সালা হবে কিভাবে? ৫৭
লালন : বাঙলার বিপ্লবী শ্রেণির সাংস্কৃতিক হেজিমনির আশ্রয় ৬০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

ধর্ম, নাস্তিকতা, পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ

ধর্ম ও নাস্তিকতা নিয়ে বাংলাদেশে বামপন্থীদের যে অবস্থান তা মোটেই ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের সাথে যায় না। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কোনো নাস্তিক্য-বাদের নাম নয়। মার্ক্স-লেনিন নাস্তিক্যবাদ প্রচারও করেননি। কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিতান্ত ধার্মিক মানুষও কমিউনিস্ট হতে পারেন। কিন্তু জনমানসে বামপন্থা বা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কেন ঠিক উল্টো ধারণা? কেন এমন ধারণা হলো? কেনই-বা বামপন্থী মানেই নাস্তিক মনে করা হয়?

আমার বিবেচনায় এর কারণ হচ্ছে :

১. বামপন্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা এবং গভীরভাবে মার্ক্স-লেনিন পাঠ না করা;

২. মার্ক্স-লেনিনের রচনার দুর্বোধ্য অনুবাদ থেকে মর্মশাঁস বের করে আনার ক্ষেত্রে এই ভূখণ্ডের মার্ক্সবাদীদের অপারগতা;

৩. সাম্রাজ্যবাদীদের কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারণায় নিজেদের নাস্তিক বলে ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তিতে ভোগা এবং কিছুটা পুলক অনুভব করা; এবং

৪. কমিউনিস্টদের নাস্তিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে ক্যাপিটালিস্টদের পৃথিবীব্যাপী অব্যাহত প্রচারণা এবং এর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নিরবতা বা কার্যকর প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হওয়া।

www.pathagar.com

তাহলে ধর্ম আর বিশ্বাস নিয়ে মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের মূল টেক্সট কী কী ছিল? আর এর ব্যাখ্যাই বা কী? এসব আলোচনায় মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের মূল টেক্সট ব্যবহার করে আমরা অগ্রসর হব। তবে যেহেতু এই আলোচনার প্রসঙ্গমূলে কমিউনিস্ট-আন্দোলন তাই আমরা কমিউনিস্ট লিটারেচারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।

মূল আলোচনা শুরুর আগে এই প্রথম পর্বে তিনটি বিষয় আলোচনা করে নিতে হবে আমাদের একটা সাধারণ বোঝাপড়া তৈরির জন্য। সেগুলো হলো :

১. পুঁজিবাদ আর ধর্মের সম্পর্ক
২. প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্য ধর্মের তফাৎ
৩. মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের পদ্ধতি

১. পুঁজিবাদ আর ধর্মের সম্পর্ক

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিই হয়ে ওঠে নতুন ঈশ্বর। নতুন ধর্ম। পুঁজিবাদ তার আগের যেসব ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা তার বিকাশ আর স্ফিতির চরিত্রের সাথে কম্প্যাটিবল বা সাযুজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে না তাকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে হয় নির্বাসন দেয় অথবা বদলে ফেলে। যেমন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্ম পুঁজির বিকাশের জন্য উপযোগী নয়, তাই তাঁরা সেটাকে পাল্টে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম বানিয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্মকে নতুন করে বিনির্মাণ করেছে। প্রটেস্ট্যানিজম হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের উপজাত খ্রিষ্ট ধর্মের রিফরমেশন বা সংস্কার। এই প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন ঘটেছে পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথেই। প্রটেস্ট্যানিজমের একটা স্পিরিট হচ্ছে প্রটেস্ট্যান্ট ওয়ার্ক এথিক বা কার্য-নৈতিকতা।[১] নৈতিকতার ধারণা যুক্ত হচ্ছে কর্মের সাথে বা পুঁজির বিকাশের সাথে, কোনো ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে নয়।

একইভাবে হিন্দু ধর্মের বেদ-উপনিষদের জায়গা করে নিয়েছে গীতা। বেদ বা উপনিষদের চাইতে গীতার কর্মযোগ পুঁজিবাদের সঙ্গে সাযুজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ। লক্ষ করলে আমরা দেখব, ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গীতা জনপ্রিয় হচ্ছে ভারতের পুঁজির উত্থানের সাথে সাথে।

---

[১] *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, Max Weber, 1905

www.pathagar.com

১৭৭৫ সালের আগে গীতা নামে কোনো মুদ্রিত বই ছিল না। মহাভারতের অংশ নিয়ে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে গীতার উদ্ভবের পুরো কৃতিত্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের। অজস্র পৃষ্ঠা থেকে ঝাড়াইবাছাই করে তাঁর সম্পাদনায় জন্মানো বইটিই গীতা! প্রথমে নামটা অবশ্য গীতা ছিল না। গীতা নামকরণ হয়েছে এরও কিছু পরে।

অষ্টাদশ শতকে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে তখন কলকাতা ও বারাণসীর ঘিঞ্জি মহল্লায় কোম্পানির কেরানি চার্লস উইলকিন্স অনুবাদ করছেন মহাভারত। তিনি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে খসড়া পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনটি আলাদা করে নেন হেস্টিংস। তার পরই তিনি ১৭৭৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর কোম্পানির চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়েল স্মিথকে চিঠি লেখেন। তিনি অনুরোধ করেন, "কোম্পানির অর্থ-দাক্ষিণ্যে এই বই মুদ্রিত হওয়া উচিত।" পরের বছরই কোম্পানির খরচে লন্ডনে উইলকিন্সের *Dialogues of Kreeshna and Arjoon in Eighteen Lectures with Notes* বইয়ের প্রকাশ। সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনূদিত প্রথম বই। বিদেশি শাসকের উদারতা ও খ্রিষ্ট ধর্মের সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার কারণে গীতার জন্ম। গীতাকে পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে হিন্দুরা মানা শুরু করেছে ১৭৭৫-এর পরে, আগে নয় কোনোভাবেই।[২]

স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, "নিউ টেস্টামেন্ট এবং গীতার উপদেশগুলিতে অনেক মিল আছে।"[৩] ইসলামের ক্ষেত্রেও লক্ষ করলে আমরা দেখব, ইসলামের মূল স্পিরিটে সুদ, রাজতন্ত্র নেই। এই ইসলাম পুঁজিবাদের সাথে সাযুজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই এমন একটা ইসলামের বয়ান তৈরি করা হচ্ছে যেখানে সুদ হারাম নয়, শুধু সুদের নাম বদলে 'সেবা' করে দিলেই ইসলামের নামে সুদের ব্যাংকিং করা যায়। উল্লেখযোগ্য, মুসলিম দেশগুলোতে রাজতন্ত্রও জেঁকে বসেছে। আদি ইসলামে জাকাত ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য। আজকে জাকাত হয়েছে ব্যক্তির প্রাপ্য। জাকাত ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় কর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয়নির্বাহ আর জাকাতের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলে এটাকে পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র থেকে

---

[২] *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত প্রবন্ধ। লিঙ্ক: http://bit.ly/1zV2jWp সম্পূরক রেফারেন্স Catherine A. Robinson, *Interpretations of the Bhagavad-Gita and Images of: The Song of the Lord*, পৃ. ৩০-৩১

[৩] বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতা কালে কালান্তরে*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৩

www.pathagar.com

সরিয়ে রাষ্ট্রের জন্য আলাদা করব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পুঁজিই মানুষের উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ ও বিনিময়ের মূল কর্তা হয়ে ওঠে। পুঁজি নেয় ঈশ্বরের জায়গা। তাই পুঁজিই হয়ে ওঠে পৃথিবীর নতুন ঈশ্বর।

ইসলামকে এই অঞ্চলে পুঁজিবাদের সাথে কম্প্যাটিবল বা সাযুজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ করে নেবার কাজটা করেছেন মউদুদী। ইসলামের সুমহান সামাজিক ভূমিকা, পরস্পরের প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধের ঐতিহ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি নতুন তত্ত্বায়ন করেছেন এভাবে :

> ইসলামি সমাজ সংস্থা সঠিকরূপে বুঝিবার জন্য সর্বপ্রথম এই কথা জানিয়া নেয়া আবশ্যক যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আসল গুরুত্ব হইতেছে ব্যক্তির সমাজ-জাতির বা সমষ্টির নয়। বস্তুত ব্যক্তি – জাতি বা সমষ্টির জন্য নয়, সমষ্টি বা জাতি ব্যক্তির জন্য। আল্লাহর নিকট একটি সমাজ, জাতি বা সমষ্টি সামগ্রিকভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে না, এক এক ব্যক্তি, তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদা সহকারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবেই দায়ী হবে – জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। আর এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহির ভিত্তির উপরেই মানুষের সমগ্র নৈতিক মূল্য ও মর্যাদা স্থাপিত।[৪]

এই ব্যাখ্যার পক্ষে যেই যুক্তি তিনি দিয়েছেন তা হচ্ছে, যেহেতু ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ব্যক্তি প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য আখেরাতে এককভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবেন, সুতরাং এই দুনিয়াতেও ব্যক্তি শুধু ব্যক্তির নিজের প্রতিই দায়িত্বশীল হবেন। আখেরাতে অন্যের প্রতি দায়িত্ব যেহেতু তার নয়, সেহেতু দুনিয়াতে অন্যের প্রতি কল্যাণমূলক কর্তব্যপালনের তাগিদও তার থাকবে না। এটা ক্যাপিটালিজমের মর্মশাঁস; স্বার্থপরতার ইন্ডিভিজুয়ালিজম। পুঁজিবাদী লেইসে ফেয়ার ভাবাদর্শের সার্থক উপস্থাপন।

কমিউনিস্ট ইশতেহারে সে-কথাও স্পষ্টভাবে বলা আছে :

> বুর্জোয়া শ্রেণির যখনই ক্ষমতা হয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সম্পর্কে মানুষ বাঁধা ছিল তার ওপরওয়ালাদের কাছে তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে।[৫]

---

[৪] সাইয়েদ আবুল আ'লা মউদুদী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, পৃ. ১০২

[৫] কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট ইশতেহার*

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ শেখায় যদি দেহ বিক্রি করে পয়সা আসে তাহলে সেটাও একটা পণ্য। এখন এই নতুন মূল্যবোধকে জায়গা করে দিতে হলে সব পুরনো নীতি-নৈতিকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়া ছাড়া তো উপায় নেই। এর জন্য ধর্ম যদি বাধা হয় তবে ধর্মকেও সে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবে, অথবা প্রয়োজনমতো নিজের উপযোগী করে গড়ে নেবে।

মার্ক্স বলেছেন,

> খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে যে ধর্মীয় তত্ত্ব খাড়া করে, বিশেষত তার বুর্জোয়া বিকাশের পর্যায়ে, যেমন প্রটেস্ট্যানিজম, দৈবতত্ত্ব ইত্যাদি, তারা খাপে খাপে এই অবস্থার সঙ্গে মিলে যায়। পুঁজিবাদ সেইসকল ধর্মতত্ত্বেরই বিনাশ ঘটায় যা তার বিকাশের পথে বাধা, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের মধ্যে বদলও ঘটায় পুঁজি যা তার খাপে খাপে মেলে।[৬]

কার্ল মার্ক্স পুঁজির সাথে ধর্মতত্ত্বের তুলনা করেছেন অসংখ্যবার এ কারণেই।

পুঁজিবাদ ধর্মের সাথে এই যুদ্ধের কাজটা করেছে কিভাবে? করেছে এনলাইটেনমেন্টের নামে, প্রগতির নামে। এর মধ্যদিয়েই ধর্মের সাথে পুঁজির একটা রাজনৈতিক ফয়সালা হয়েছে। এই লড়াইটা চলেছে বুর্জোয়াদের হাত ধরে। তাই এই এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে বুর্জোয়া-বিকৃতিও আছে। এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে থাকা বুর্জোয়া-বিকৃতি কমিউনিস্টরা ধারণ করে না। তাই এই লড়াই যখন শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে হবে তখন সেটার পথরেখা হবে ভিন্ন। লেনিন সেটা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্য ধর্মের তফাৎ

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের ধর্মভাবনা এক নয়। প্রাচ্যে ধর্ম মানে শুধু রিলিজিওন বা ধর্মতত্ত্ব নয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি, মহাভারতেও অসংখ্যবার ধর্মযুদ্ধ, ধর্মরক্ষা এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে। মহাভারতের এই 'ধর্ম' মানে রিলিজিয়ন বলতে আমরা যা বুঝি সেটা নয়। মহাভারতেই বহুল উচ্চারিত এই 'ধর্মের' সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি এই ধর্ম মানে : ১. রাজনীতি শাস্ত্র, ২.

---

[৬] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy. Vol I, trs. Ben Fowkes. Vintage books 1977. P. 172

www.pathagar.com

নীতিশাস্ত্র, এবং ৩. আইনশাস্ত্র। অর্থাৎ সেই সময়ে ধর্ম মানে মোটাদাগে আইন এবং ন্যায়বিচারকেই বোঝানো হতো। সেই বিবেচনার সূত্র ধরেই আমরা এখনো আদালতের বিচারককে ধর্মাবতার বলে সম্বোধন করি। উপনিষদে ধর্মকে বলা হয়েছে রাজশক্তির উগ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পদ্ধতি। রাজশক্তির উগ্রতা ও ক্ষমতা তাকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। তাই সুশাসনের জন্য, ন্যায়ের জন্য তার একটি নিয়ন্ত্রক দরকার। ঈশ্বর সকলের কল্যাণের জন্য রাজশক্তির নিয়ন্তা হিসেবে ধর্মকে সৃষ্টি করলেন। আজকের ক্ষমতার নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মতো।

উপনিষদ আরো স্পষ্ট করে বলেছে, যার শক্তি নেই, যার বল নেই, সেও এই ধর্মের বলে বলবত্তর ব্যক্তিকে জয় করতে পারে। এই ধর্ম এক লোক-ব্যবহার এবং রাষ্ট্রপদ্ধতি, যার কাছে দুর্বল পায় ন্যায় ও সুবিচার।

ইসলামেও ধর্ম মানে শুধু থিওলজি নয়। ধর্ম মানে জীবনবিধান, ধর্ম মানে নেতৃত্ব, ধর্ম মানে সম্পদের বন্টন, ধর্ম মানে ন্যায্যতা। আজকে একজন দরিদ্র মানুষ জুলুমের শিকার হলে বলে, 'আল্লাহ বিচার করবেন'; এই কথার মধ্যে নিশ্চয় বুঝতে পারি এই লোকায়ত ধর্মভাবনার মধ্যে আছে ন্যায়বিচার, যেটা পৃথিবীতে হয় না কিন্তু নিশ্চয় একসময় হবে আল্লাহর মাধ্যমে।

মার্ক্স নিজেও প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রাচ্যের ইতিহাস কেন সবসময় ধর্মের ইতিহাস হিসেবে হাজির হয়?" এই প্রশ্নের জবাব মার্ক্স দিয়ে যাননি। আমরা পরে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব কেন প্রাচ্যের ইতিহাস ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়।

৩. মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের পদ্ধতি

মার্ক্স বলেছিলেন, "আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি মানুষ থেকে শুরু হয় না, শুরু হয় বৈষয়িকভাবে হাজির থাকা সামাজিক কালপর্ব বিচার থেকে।" ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় পর্যালোচনাও শুরু করতে হবে বৈষয়িকভাবে হাজির থাকা সামাজিক কালপর্বের বিচার থেকে। একটি বিশেষ সমাজে এবং বিশেষ সময়ে ধর্ম, অধর্ম, নাস্তিকতা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি সেই বৈষয়িক সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয়, সুনির্দিষ্ট অর্থ পরিগ্রহ করে। ধর্মের আলোচনায় আমরা বৈষয়িক সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের বিচার মার্ক্স-এঙ্গেলস কিভাবে করেছেন সেটা পরে দেখব।

www.pathagar.com

এবার ধর্ম সম্পর্কে বাংলাদেশের বামপন্থীদের অবস্থান। তাদের লিখিত ডকুমেন্টে যে অবস্থান তা ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের অনুসরণ। অর্থাৎ ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা থাকবে; ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। আর দলগুলোর ভিতরে অলিখিত চর্চায় আর আলোচনায় আছে অসংখ্য মত, যার মধ্যে প্রভাবশালী হচ্ছে 'নাস্তিক না হলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না'।[৭]

[৭] ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন সিপিবি-র রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে এই চর্চার কথা আমার জানা।

www.pathagar.com

দুই

ধর্মের বিপ্লবী চরিত্র

ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব সব ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণির বিদ্রোহের ইতিহাস। পুরনোর ধ্বংসস্তূপে নতুন আরেক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। সকল ধর্মের প্রবর্তকেরাও ছিলেন সমাজ-সংস্কারক আর বিপ্লবী। আমরা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাই এঙ্গেলস থেকে। ধর্মের এই বিপ্লবাত্মক ভূমিকা এঙ্গেলসের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি সঠিকভাবেই ধর্মের বিপ্লবী চরিত্র উন্মোচন করেছেন। তবে তিনি সেটা করেছেন মূলত খ্রিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে আর কিছুটা ইসলাম সম্পর্কে। ভারতের ধর্মের পর্যালোচনা মার্ক্স বা এঙ্গেলস করে যেতে পারেননি।

খ্রিষ্ট ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন:

> খ্রিষ্ট ধর্ম যখন আদিতে প্রবর্তিত হচ্ছিল তখন তার সঙ্গে আধুনিককালের শ্রমিকশ্রেণির লড়াই-সংগ্রামের লক্ষণীয় মিল আছে।[৮]

'খ্রিষ্ট ধর্মের আদি ইতিহাস' নিবন্ধে এঙ্গেলস আরো লিখেছেন :

> শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের মতোই খ্রিষ্ট ধর্ম আদিতে ছিল নির্যাতিত মানুষের সংগ্রাম; প্রথমে তা দাসদের, মুক্তি লাভ করা দাসদের, সকল অধিকারবঞ্চিত সর্বহারা আর রোম যাদের অধীনস্ত আর ছত্রভঙ্গ করে রেখেছে সেই

[৮] কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮১, মস্কো, পৃ. ৩০৩

www.pathagar.com

> মানুষগুলোর ধর্ম ছিল। যিশু খ্রিষ্টের ধর্ম আর শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র দাসত্বের শৃঙ্খল আর দুর্দশা থেকে আসন্ন মুক্তির বার্তা ঘোষণা করে, খ্রিষ্ট ধর্ম সেই মুক্তি পাবার কথা বলে পরকালে। সমাজতন্ত্র সেই মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয় এই পৃথিবীতে ইহলোকে, সমাজকে বদল করে। উভয়েরই কপালে জুটেছে তাচ্ছিল্য আর অত্যাচার। এদের অনুসারীদের দমন করার জন্য বিশেষ আইন হয়েছে। ধর্মানুসারীদের অপরাধী করা হয়েছে মানব জাতির শত্রু বলে, আর অন্যদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে, সমাজের শত্রু হিসেবে। আর যাবতীয় নির্যাতন সত্ত্বেও, দুটোই জয়যুক্ত হয়ে, দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলে।[৯]

এমনকি খ্রিষ্ট ধর্মকে এঙ্গেলস সমাজতন্ত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সেইসময় যতটুকু সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব ছিল সেটা খ্রিষ্ট ধর্মের মাধ্যমেই হয়েছে বলে রায় দিয়েছেন। আন্তন মেঙ্গেরের 'রাইট টু দ্য ফুল প্রোডাক্ট অব লেবার' বইয়ে কৌতুক মিশ্রিত শ্লেষের সাথে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "Fall of the Western Empire was followed not by Socialism." (পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে সেখানে সমাজতন্ত্র এলো না কেন?)[১০]

এঙ্গেলস কী উত্তর দিয়েছিলেন লক্ষ করি। এঙ্গেলস বলেছিলেন,

> তিনি লক্ষ করেননি যে, এই সমাজতন্ত্র তখনকার দিনে যতখানি সম্ভব ছিল সেই পরিমাণে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ছিল, এমনকি প্রাধান্য লাভ করেছিল খ্রিষ্ট ধর্ম হিসেবে।[১১]

অর্থাৎ, এঙ্গেলস বলছেন, খ্রিষ্ট ধর্ম আসলে সমাজতন্ত্রের একটা রূপ; সেটা আজকের দিনের মতো নয়, কিন্তু সেই সময়ের সমাজতন্ত্রের যেটা হওয়া সম্ভব ছিল সেটাই হয়ে উঠেছিল খ্রিষ্ট ধর্ম।

ইসলামের উদ্ভবের বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে এঙ্গেলস লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। মার্ক্সের সাথে পত্রালাপও শুরু করেছিলেন। মার্ক্স আগ্রহের সঙ্গে এঙ্গেলসের দেয়া সেই পত্রের উত্তরও লিখেছিলেন; কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ লেখার মতো করে পরিছন্ন উপস্থাপনা করে যেতে পারেননি মার্ক্স বা এঙ্গেলস কেউই। তবে এঙ্গেলস মার্ক্সের কাছে লিখিত পত্রে ইসলামের উদ্ভবের সময় তার ভিতরে গড়ে ওঠা বিপ্লবী চরিত্র লক্ষ করেছিলেন দরিদ্র বেদুঈনদের সাথে সচ্ছল ও ধনী কোরাইশদের সংঘাতের মধ্যে।

---

[৯] এঙ্গেলস, 'খ্রিষ্ট ধর্মের আদি ইতিহাস', *ধর্ম প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮১, মস্কো, পৃ. ৩০৩

[১০] The Right to the Whole Product of Labour. Anton Menger. P. 113

[১১] Frederick Engels, On the History of Early Christianity, Chapter I, 1894

www.pathagar.com

এঙ্গেলস দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ধর্মের বিপুল প্রভাব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন এবং কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন,

> এটা কী করে সম্ভব যে রোম সাম্রাজ্যের মানুষগুলো অন্য সমস্ত ধর্মের চেয়ে এই অর্থহীন জিনিসটাকে (খ্রিষ্ট ধর্ম) – যার প্রচার চালিয়েছিল দাস আর উৎপীড়িতরাই-এতই বেশি পছন্দ করল যাতে উচ্চাভিলাষী কন্সট্যান্টিনও শেষতক বিবেচনা করলেন অর্থহীন ধর্মটা গ্রহণ করাই রোমক দুনিয়ার একচ্ছত্রাধিপতির আসনে নিজেকে মহিমান্বিত করার সর্বোত্তম উপায়?[১২]

একই ঘটনা ঘটেছিল ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের উদ্ভবের সময়। সিন্ধু সভ্যতার মূল বিশেষত্ব ছিল এর উন্নত পানি-ব্যবস্থাপনা। সিন্ধু পরিবেষ্টিত ছিল সাতটি নদী দিয়ে, যেটাকে বলা হতো সপ্ত সিন্ধু। এখান থেকেই 'সাতসমুদ্র' কথাটা এসেছে। শুধু আমাদের সংস্কৃতিতে নয়, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে 'সাত সমুদ্র' শব্দবন্ধটি বারে বারে এসেছে এক সমৃদ্ধ জনপদের বিতাড়িত অধিবাসীদের নস্টালজিয়া থেকে। এই সাত নদী আর তার শাখা-প্রশাখায় বাঁধ আর ব্যারেজ দিয়ে এক বিপুল সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করেছিল সিন্ধুবাসীরা। ফলে ফসলে, বিত্তে, বৈভবে সিন্ধু একটি অতি সমৃদ্ধ সভ্যতায় উন্নীত হয়। এখানে উন্নত শিপিং ডক পাওয়া গেছে। এই সিন্ধু থেকে সমুদ্রপথে পণ্য যেত মেসোপটেমিয়াতে। সিন্ধুতে উৎপন্ন হতো এমন দ্রব্য মেসোপটেমিয়াতেও পাওয়া গেছে। এখানে পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় স্লুইস গেটের অস্তিত্বের প্রমাণও পাওয়া গেছে। চক্রাকার চাবি দিয়ে স্লুইস গেট ও পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এই চক্র ছিল ক্ষমতার প্রতীক। অশোক চক্র, ভারতের পতাকার চক্র ভালো করে খেয়াল করে দেখলে আমরা দেখব, সেটা নির্দোষ কোনো চাকা নয়, বরং খাঁজকাটা গিয়ার।

কিন্তু সিন্ধুতে দীর্ঘমেয়াদে বাঁধ আর ব্যারেজের কারণে অবধারিতভাবে অপ্রত্যাশিত বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। জমি উর্বরাশক্তি হারাতে থাকে। মহেঞ্জোদারো সাতবার ভীষণ বন্যায় আক্রান্ত হয়। বিক্ষুব্ধ হতে হতে যুদ্ধংদেহি হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। এই সময় ঋগ্বেদ লেখা হয়। পুরো ঋগ্বেদে আমরা পাই যুদ্ধের প্রস্তুতি; মূল যুদ্ধ আর যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা নানা রূপকে। এই যুদ্ধ সিন্ধুর শাসকদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের, যে-যুদ্ধে নেতৃত্ব আর আদর্শিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয় ঋগ্বেদের ঋষিরা। ঋগ্বেদ গণমানুষের সেই বিদ্রোহের ইতিহাসকে ধারণ করছে।[১৩]

---

[১২] Frederick Engels, *Bruno Bauer and Early Christianity*, 1882

[১৩] শামসুজ্জোহা মানিক ও শামসুল আলম চঞ্চল, *আর্য জন ও সিন্ধু সভ্যতা*, বদ্বীপ প্রকাশনী

www.pathagar.com

তিন

‘প্রাচ্যের ইতিহাস কেন সব সময় ধর্মের ইতিহাস হিসেবে হাজির হয়?’

মার্ক্স নিজে যে প্রশ্ন করেছিলেন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, “প্রাচ্যের ইতিহাস কেন সব সময় ধর্মের ইতিহাস হিসেবে হাজির হয়?” এবং যার উত্তর তিনি দিয়ে যেতে পারেননি, এবারে আমরা সেই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজব ভারতবর্ষের কৃষক-আন্দোলনের চারিত্র্যলক্ষণ বিচারে। আমরা দেখার চেষ্টা করব, প্রাচ্যের নিপীড়িতরা কেন নিজেকে সব সময় ধর্মের কাছে সমর্পণ করে।

বাংলার কৃষক-চৈতন্যকে কৃষির উদ্ভবের সময় থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, বাংলার কৃষিসমাজে সবসময় একটা কর্তৃত্ব আর আনুগত্যের ধারণা প্রবহমান ছিল। কৃষকের ওপরে কর্তৃত্ব ফলায় শক্তিকেন্দ্র, আর কৃষক মনে করে শক্তিকেন্দ্রের অনুগত থাকা কৃষকের কর্তব্য। কৃষকের চোখে ক্ষমতার কেন্দ্র যত দূরবর্তী সেখানে ন্যায় বা ন্যায্যতার অবস্থান তত নিরঙ্কুশ। তাই সে দূরবর্তী কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে নিকটবর্তী কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করার হিম্মত পায়। বাংলার কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একটি কর্তৃত্বকে কৃষক অস্বীকার করছে, কিন্তু ঠিক তার পরের উচ্চতর কর্তৃত্বের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করছে বা নিবেদন করছে। ইজারাদারের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে সমর্পণ করছে, জমিদারের বিরুদ্ধে কোম্পানির কাছে

www.pathagar.com

সমর্পণ করছে, কোম্পানির বিরুদ্ধে রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে সমর্পণ করছে, আর রানি ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খোদ ধর্মরাজ বা নিরঞ্জনের কাছে সে নালিশ জানাচ্ছে। এক কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে আরেক কর্তৃত্বকে নাকচ করে দেয়া যায়। সে কারণেই দেখা যায়, খোদ কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করছে কৃষক মহারানি ভিক্টোরিয়ার নাম নিয়ে। পূর্ববঙ্গে কৃষির উদ্ভবের সময়ও পীর বা মুর্শিদের সাথে এই কর্তৃত্ব আর আনুগত্যের সম্পর্কে জড়িত ছিল কৃষকেরা।

রাশিয়াতেও কৃষক বারে বারে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে জারের নাম নিয়েই। বর্তমান মিথ্যা জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হারিয়ে যাওয়া আসল জারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য লড়াই করেছে। রাশিয়ার কৃষক-বিদ্রোহের নেতা পুগাচেভ ছিলেন এমন একজন হারিয়ে যাওয়া জার। বাংলার কৃষক-বিদ্রোহেও দেখি, কৃষক-বিদ্রোহের নেতা নূরলদিনকে রংপুরের নবাব বলে ঘোষণা দেয় বিদ্রোহী কৃষকেরা। শেরপুরের বিদ্রোহী কৃষকেরা টিপু শাহকে রাজার পদ নিতে অনুরোধ করে। ক্ষমতাকে নাচক করতে গেলে ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিপরীত ক্ষমতার ধারণা দাঁড় করাতে হয় কৃষককে। ধর্মচেতনায় সেই পাল্টা ক্ষমতার উৎস খুঁজে পায় কৃষকেরা। বাংলার সকল কৃষক-বিদ্রোহ তাই ধর্মাশ্রয়ী।

প্রাক-ধনতান্ত্রিক বা আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ খুব বেশি আগের কথা নয়। কৃষকশ্রেণি থেকে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের মধ্যবিত্তসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই কর্তৃত্ব আর আধিপত্যের ধারণা ক্রিয়াশীল। আধুনিক মহাশক্তিমান রাষ্ট্রের কাছে সে যখনই অন্যায় আর অন্যায্য আচরণের মুখোমুখি হয়, তখনই সে তার চৈতন্যের গভীরে রাষ্ট্রের চাইতে আরেক মহাশক্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করে। এভাবেই আমাদের দেশের মতো দেশে রাজনীতিতে ধর্মের অধিকতর ভূমিকার অবজেক্টিভ কন্ডিশন বা বস্তুগত শর্ত তৈরি হয়ে যায়। রাষ্ট্রের ন্যায্য আর গণতান্ত্রিক আচরণই ধর্মের কাছে কোনো জনগোষ্ঠীর বিপজ্জনক সমর্পণের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ।

এঙ্গেলস ষোড়শ শতাব্দী থেকে গণমানুষের লোকায়ত লড়াইয়ে ধর্মের ভূমিকার কথা স্পষ্টই বলেছেন। তাঁর 'জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ' বইয়ে লিখেছেন,

> এমনকি ষোল সতকের যেগুলিকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয় সেগুলিতেও প্রধানত জড়িত ছিল বিভিন্ন স্পষ্ট বৈষয়িক শ্রেণিস্বার্থ; সেগুলি ছিল শ্রেণিযুদ্ধও, ঠিক

www.pathagar.com

যেমন ছিল ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষগুলো। যদিও তখনকার শ্রেণিসংগ্রামগুলো চলত ধর্মীয় বাগধারা অবলম্বন করে, যদিও বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ, প্রয়োজন এবং দাবিদাওয়া থাকত ধর্মীয় পর্দার আড়ালে, তাতে বিষয়টার কিছুই বদলাত না, তদানীন্তন পরিবেশ থেকে সেটা বোঝা যায় সহজেই।[১৪]

মার্ক্সও নিম্নকোটির চৈতন্যে ধর্মের অবস্থানের বিষয়ে খুব পরিষ্কার মন্তব্যই করেছেন:

> সেই জগতের (নিম্নকোটির) সাধারণ তত্ত্ব হল ধর্ম, তার বিশ্বকোষ ও সংহিতা, লোকগ্রাহ্য ভঙ্গিতে, আর তার যুক্তি, তার পারত্রিক মর্যাদা, ...তার সর্বজনীনের সান্ত্বনার ও গ্রাহ্যতার উৎস।[১৫]

ইউরোপের লড়াইয়ের ধর্ম-চরিত্র উদ্ঘাটন করলেও মার্ক্স প্রাচ্য প্রসঙ্গে ফয়সালাটা নিজে করে যাননি, ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছিলেন। প্রাচ্যের লড়াইয়ে ধর্মের প্রসঙ্গ-বিচার এসেছে সম্প্রতি সাব অল্টার্ন স্টাডিজের বরাতে। গৌতম ভদ্র তাঁর 'ইমান ও নিশানে' ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

> ধর্মভাব চৈতন্যের এক বিশেষ স্তর। কিন্তু প্রাক-ধনতান্ত্রিক বা আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজে এই চৈতন্যের মধ্যেই মানুষ তাঁর পরিদৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতাকে বোঝার সূত্র খুঁজে বের করে আবার সময় সময় তার নিজের ও চারপাশের সমাজের নানা কর্তব্য বা ইতিকর্তব্যকে ধরার চেষ্টা করে। বারবার আমরা দেখব পাপ/পুণ্য, ন্যায়/অন্যায় বোধ কিভাবে ধর্মবোধের মধ্যে নিহিত আছে। ...হয়তো সেটাই ধর্মভাবের শক্তি। রূপান্তরের অনন্ত সম্ভাবনা, চৈতন্যের খোলামেলা রূপ, অনিশ্চয়তা, কোনো লৌহকঠিন কাঠামোর মধ্যে যাবার বিরুদ্ধে অন্তর্লীন অনীহা ধর্মভাবকে এমন এক শক্তি দেয় যে তার মধ্যেই বারবার নিম্নকোটি (সাব অল্টার্ন) খুঁজে পায় তার প্রতিবাদের ভাষা, উচ্চকোটির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে তুচ্ছ করার তাগিদ।[১৬]

গৌতম ভদ্র খুব স্পষ্টভাবেই নিম্নকোটির এই লড়াই কেন ধর্মীয় চেহারা নিয়ে বারবার সামনে দাঁড়ায় সেটা উন্মোচন করেছেন।

---

[১৪] কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮১, মস্কো, পৃ. ৯৬

[১৫] Karl Marx. 'Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law', Collected works, Vol 3, Moscow, 1975, page 175

[১৬] গৌতম ভদ্র. *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, পৃ. ৯-১০

www.pathagar.com

বাংলার কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য ইতিহাসবিদ শ্রী বিনয়ভূষণ চৌধুরী নিদর্শনসহ পূর্বভারতের কৃষক-আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> সেখানে বিদ্রোহের 'যৌথ সিদ্ধান্ত' ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত। এখানে বিদ্রোহের বিশ্বাসের উৎস ধর্ম ...সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর সাধনই যেখানে বিদ্রোহের মূল প্রেরণা, সেখানেই ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়।[১৭]

আন্তেনিও গ্রামসিও কাণ্ডজ্ঞান বা কমন সেন্সের সাথে ধর্মের যোগসূত্র দেখেছেন। ইতালির কৃষক-চৈতন্যে যে কা-জ্ঞান তা ধর্ম থেকেই জাত, সেটা বলে গ্রামসি রায় দিয়েছেন। তবে কৃষকের ধর্ম আর শোষকের ধর্মের ভিতরে চরিত্র বিচার করে পার্থক্য নির্দেশ করতে গ্রামসি ভোলেননি। প্রিজন নোটস্-এ তিনি লিখেছেন:

> The principle elements of common sense are furnished by religion, and so the relationship between religion and common sense is much more intimate than that between common sense and the philosophical systems of the intellectuals.[১৮]

অর্থাৎ –

> কাণ্ডজ্ঞানের মূল উপাদান আসে ধর্ম থেকে। তাই কাণ্ডজ্ঞান আর বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক সিস্টেমের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক তার চাইতে ধর্ম আর কাণ্ডজ্ঞানের ভিতরে যে আন্তঃসম্পর্ক সেটা আরো বেশি ঘনিষ্ঠ।

---

[১৭] বিনয়ভূষণ চৌধুরী, ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন ১৮২৪–১৯০০, ইতিহাস অনুসন্ধান, ৩য় খণ্ড, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৩৫, ৬৮১

[১৮] Brian P. Copenhaver, *From Kant to Croce: Modern Philosophy in Italy, 1800-1950.* Chapter: Gramsci. Introduction to Philosophy, p. 335

www.pathagar.com

চার

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে হলেই কি নাস্তিক হতে হবে?

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হলেই কি নাস্তিক হতে হবে? বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার পরে কি সবাই নাস্তিকে পরিবর্তিত হয়? এই জরুরি প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব লেনিন ও এঙ্গেলসে।

১৯০৯ সালে লেনিন লেখেন 'The Attitude of the Workers' Party to Religion' প্রবন্ধটি। সেখানে লেনিন স্পষ্টভাবেই এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, এঙ্গেলস সবসময় অতি-বাম এবং অতি-বিপ্লবীদের পার্টি কর্মসূচিতে নাস্তিক্যবাদ অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। লন্ডনে নির্বাসিত Blanquist Fugitive Communard-এর মেনিফেস্টোতে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণাকে এঙ্গেলস সরাসরি আহাম্মকি বলেছেন। লেনিন একটা উদাহরণ দিয়েছেন, যদি একজন পাদ্রি কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্যপদ নিতে আসে এবং পার্টির কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয় তবে তাকে সদস্যপদ দেয়া হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই পার্টির র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল ব্যবহার করে সেই পাদ্রি পার্টির অভ্যন্তরে ধর্ম প্রচার করতে পারবে না। তার মানে, নিতান্ত একজন প্র্যাক্টিসিং বা আচারী ধার্মিকও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে পারেন। লেনিন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খেয়ে-না-খেয়ে যুদ্ধ করে বেড়ানোকে মোটেই কমিউনিস্টসুলভ বলেননি; এই ধারাকে তিনি নৈরাজ্যবাদী ধারা বলেছেন। সেই প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেছেন:

www.pathagar.com

যে নৈরাজ্যবাদী খেয়ে-না-খেয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচারণা করে বেড়ায় সে আসলে ধর্মের ব্যবসায়ী আর বুর্জোয়াদের স্বার্থই রক্ষা করে।[১৯]

কিন্তু ধর্মের সাথে রাজনৈতিক ফয়সালা কি কমিউনিস্টরা করবেন না? নিশ্চয় করবেন, তবে সেই কর্তব্য প্রথমত কমিউনিস্টদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সেই রাজনৈতিক ফয়সালার পদ্ধতি কমিউনিস্টদের জন্য আলাদা। সেই ফয়সালার পথটা কেমন? আসুন, লেনিনের লেখা থেকেই দেখি:

ধর্মীয় প্রশ্নকে বিমূর্ত, আদর্শবাদী কায়দায়, শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'বুদ্ধিবাদী' প্রসঙ্গরূপে উপস্থাপিত করার বিভ্রান্তিতে আমরা কোনো অবস্থায়ই পা দেব না; বুর্জোয়াদের রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রায়ই যা উপস্থাপিত করে থাকে।[২০]

নাস্তিকতা কি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি হতে পারে? অবশ্যই না। লেনিন তাঁর লেখায় এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

মানুষের ওপর চেপে থাকা ধর্মের জোয়াল আসলে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থারই ফল। এ অবস্থায় নিজের অর্থনৈতিক মুক্তির তাড়না তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে অন্য কোনো প্রচার দিয়েই আলোকপ্রাপ্ত করা সম্ভব না। পরলোকে স্বর্গ সৃষ্টি নিয়ে মানুষের ঐক্য তৈরির চেয়ে পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টির জন্য নির্যাতিত শ্রেণির ঐক্য আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই আমাদের কর্মসূচিতে আমরা নাস্তিকতাবাদ ঘোষণা করিনি, করা উচিতও নয়। এ কারণেই যেসব খেটে খাওয়া মানুষ আজও পুরনো কুসংস্কারের কোনো-না-কোনো ধ্বংসাবশেষ আঁকড়ে রেখেছে তাদের আমাদের পার্টির কাছাকাছি আসতে বারণ করা হয়নি, করা উচিতও নয়। আমরা সব সময়ই বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা প্রচার করব। নানাবিধ ধর্মীয় অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের প্রয়োজন। এর অর্থ মোটেই এই নয় যে ধর্মের প্রশ্নকে আমাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া উচিত, যা তার প্রাপ্য নয়।[২১]

লক্ষ করি, এখানে 'ধর্মীয় অসঙ্গতি' শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়েছে, 'ধর্ম' নয়। সমাজতন্ত্র, নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে লেনিন আলোচনা করেছেন। 'সমাজতন্ত্র ও ধর্ম' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি তিনি

---

[১৯] Lenin, *Collected Works*, Vol. 15, Progress Publishers, 1973, Moscow, pp. 402-413.

[২০] লেনিন, 'The Attitude of the Workers' Party to Religion'

[২১] Lenin, *Collected Works*, Vol. 15, Progress Publishers, 1973, Moscow, pp. 402-413.

www.pathagar.com

লিখেছেন, যার একটি অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এবার আমরা এই পুরো লেখাটি দেখতে পারি। লেনিন সেখানে লিখেছেন:

> ধর্মীয় প্রশ্নকে বিমূর্ত, আদর্শবাদী কায়দায়, শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'বুদ্ধিবাদী' প্রসঙ্গরূপে উপস্থাপিত করার বিভ্রান্তিতে আমরা কোনো অবস্থায়ই পা দেব না; বুর্জোয়াদের রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রায়ই যা উপস্থাপিত করে থাকে। শ্রমিক জনগণের অন্তহীন শোষণ ও কর্কশ জীবন যে সমাজের ভিত্তি, সেখানে বিশুদ্ধ প্রচারমাধ্যমে ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণের প্রত্যাশা বুদ্ধিহীনতার নামান্তর। মানুষের ওপর চেপে থাকা ধর্মের জোয়াল যে সমাজমধ্যস্থ অর্থনৈতিক জোয়ালেরই প্রতিফলন ও ফল, এটা বিস্মৃত হওয়া বুর্জোয়া সংকীর্ণতারই শামিল। পুঁজিবাদের তামসিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনালাভ ব্যতীত যেকোনো সংখ্যক কেতাব, কোনো প্রচারে প্রলেতারিয়েতকে আলোকপ্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। পরলোকে স্বর্গ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রলেতারিয়েতের মতৈক্য অপেক্ষা পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টির জন্য নির্যাতিত শ্রেণির এই সত্যকার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐক্য আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[২২]

লক্ষ করি, লেনিন বলছেন, শুধু বিশুদ্ধ প্রচার করে এমনকি ধর্মীয় কুসংস্কার পর্যন্ত দূর করা যায় না। এর জন্য দরকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম। সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিজয়ের পরে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল কী হবে? এটাও লেনিন স্পষ্ট করেছেন।

লেনিন বিপ্লবের পরে নারী-শ্রমিকদের প্রথম রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন ১৯ নভেম্বর, ১৯১৮। সেখানে তিনি এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেন:

> ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রামে অসাধারণ সতর্ক হওয়া চাই। এ সংগ্রামে যারা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে তারা অনেক ক্ষতি করে। প্রচারের মাধ্যমে, জ্ঞানপ্রচারের মাধ্যমে লড়াই চালানো উচিত। সংগ্রামে তিক্ততা সৃষ্টি করে আমরা জনগণকে রুষ্ট করে তুলতে পারি; এ রকম সংগ্রামে ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের বিভক্তি স্থায়ী হয়ে পড়ে, অথচ আমাদের শক্তিই হলো একতা। ধর্মীয় কুসংস্কারের গভীরতম উৎস হলো দারিদ্র্য ও তমসাচ্ছন্নতা; এই অভিশাপের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবেই।[২৩]

লক্ষ করি, লেনিন এখানেও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছেন, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই তো

---

[২২] লেনিন, *সমাজতন্ত্র ও ধর্ম*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কোলকাতা, পৃ. ৭

[২৩] Lenin, *Collected Works*, Vol. 28, Progress Publishers. Moscow, 1974, pages 180-182

www.pathagar.com

কমিউনিস্ট কেন, ধর্মবাদীরাও করে। ১৯১৮ সাল; বিপ্লব সম্পন্ন, তাও লেনিন এই ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও কত সতর্ক!

লেনিন জীবিত থাকা অবস্থায় রাশান কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচিতে ধর্ম প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা আছে:

> ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত পড়াটা সযত্নে এড়িয়ে চলা আবশ্যক, কেননা অমন আঘাত পড়লে ধর্মীয় উন্মাদনা বাড়াতেই তা সাহায্য করে।[২৪]

লেনিনের মতে, মার্ক্সবাদকে অবশ্যই ধর্মের প্রশ্নটি বিবেচনায় নিতে হবে। এবং সেজন্য ধর্মকে পর্যালোচনা করার পদ্ধতি জানতে হবে। ধর্মের সাথে রাজনৈতিক ফয়সালার বিষয়ে নীতিকৌশল স্থির করতে হবে। আর, ধর্মবিশ্বাসের উৎসকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। শুধু বিমূর্ত মতাদর্শিক বক্তৃতা দিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কাম্য নয়। লড়াইটা শ্রেণিসংগ্রামের সাথে যুক্ত হতে হবে, যাতে কিভাবে ধর্ম সামাজিকভাবে উৎপত্তি লাভ করে ও বিকাশ হয় সেই মূল প্রশ্নে যাওয়া যায় এবং বুঝতে পারা যায় কখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বস্তুগত প্রয়োজন ফুরায়। লেনিন প্রশ্ন তুলছেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী কেন সব সময় ধর্মভীরু হয়? এর উত্তরে লেলিন বলেন, প্রগতিশীল বুর্জোয়া, র‍্যাডিক্যাল [তথাকথিত] ও বুর্জোয়া বস্তুবাদীরা খুব সহজেই এর উত্তর দেন, তারা বলেন, এটা জনসাধারণের অজ্ঞানতা। কাজেই, তারা [প্রগতিশীল বুর্জোয়া] ধর্ম ছাড়তে বলেন এবং নাস্তিক্যবাদের জয়গান গান। লেনিনের মতে, এই পদ্ধতিটি সংকীর্ণ ও অগভীর বুর্জোয়া সংস্কৃতিবাদ। এই মতবাদটি আসলে ধর্মের বস্তুগত উৎসকে ব্যাখ্যা করে না। এটি মতাদর্শিকভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করে, বস্তুগতভাবে নয়। আসলে আধুনিক সমাজে ধর্ম বা ধর্মভীতির মূল উৎস শ্রমজীবী মানুষের ওপর সামাজিক নির্যাতন এবং আপাতদৃষ্টিতে খেটে খাওয়া মানুষের বাস্তব অসহায়ত্ব; যেখান থেকে প্রবলভাবে ঈশ্বরের প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে। পুঁজিবাদ এমন একটি অপ্রকাশ্য [শ্রমিকদের কাছে] শক্তি, যা শ্রমজীবী মানুষের দুঃখকষ্ট প্রতিনিয়ত বাড়ায়; যা যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের চেয়েও ভয়াবহ। আধুনিক ধর্মগুলোর সৃষ্টির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ এবং নিপীড়নের ইতিহাসে।

---

[২৪] Lenin, *Collected Works*, 4th English Edition, Vol. 29, Progress Publishers, Moscow, 1972, pp 97-140

www.pathagar.com

তাই, কোনো শিক্ষামূলক বইপুস্তক, এমনকি নাস্তিক্যবাদের প্রচারণা গণমানুষের মন থেকে ধর্ম দূর করতে পারবে না।

লেনিনের মতে, ধর্মকে একটি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা উচিত। আসলে এটাই ধর্ম বিষয়ে সমাজতন্ত্রের মনোভাব (attitude)। তবে, বিষয়টিকে আরো সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। লেনিন বলেন, প্রথমত রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথেও রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই। যে যার ইচ্ছামতো ধর্মবিশ্বাস ধারণ করতে পারে। অথবা কারো ধর্মবিশ্বাস না থাকলেও সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নাগরিক অধিকার নির্ধারণ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় গোষ্ঠীকে রাষ্ট্র থেকে কোনো ধরনের আর্থিক বা অন্য কোনো সহযোগিতা করা যাবে না। তবে একটি সাম্যবাদী মতাদর্শ বিশ্বাসী দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। পার্টির অগ্রসর সদস্যদের বিজ্ঞানমনস্ক ও সংস্কারমুক্ত থাকা প্রয়োজন। তারপরও ধর্মবিশ্বাসীদের পার্টিতে নেওয়া হয়। কারণ, যে-সমাজ নির্মিত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের মাধ্যমে, সে-সমাজ থেকে ধর্মীয় সংস্কার বক্তৃতার মাধ্যমে দূর করা যাবে না। সমাজে ধর্মের জোয়াল আসলে অর্থনৈতিক জোয়ালের প্রতিফলন এবং উপজাত। কিন্তু উগ্র নাস্তিকেরা এটাকে স্বীকার করতে চায় না। তাই তারা লেখালেখি বা তর্কের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস দূর করতে চায়। এখানেই 'উগ্র নাস্তিক'দের সাথে 'কমিউনিস্ট'দের পার্থক্য। কমিউনিস্টরা প্রথমত শ্রেণিসংগ্রামকে তীক্ষ্ণ করে শ্রেণির বিলোপ চায়। এবং সেই সংগ্রামের অনেক উপজাতের মধ্যে একটা উপজাত হিসেবে মানুষের ওপর থেকে ধর্মের জোয়াল সরানোর জন্য তাদেরকে পুঁজিতন্ত্রের অন্ধকার শক্তির সাথে লড়াই করতে শেখাতে চায়, এবং ধর্মের সাথে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার এই লড়াই খোদ শ্রেণিসংগ্রামের অধীনস্ত। শ্রেণিসংগ্রামকে যদি এই লড়াই বাধাগ্রস্ত করে তবে সেই লড়াইয়ের দরকার নেই। এসব কারণেই পার্টিতে নাস্তিক্য-বাদের ঘোষণা দেওয়া হয় না।

লেনিন নাস্তিক্যবাদের প্রচারণাকে মূলত ভাববাদী কায়দা বলেছেন এবং মার্ক্সবাদের সাথে তার তফাৎ নির্দিষ্ট করেছেন এভাবে:

> কেন শহরের প্রলেতারিয়েতদের পিছিয়ে পড়া অংশ, আধা-প্রলেতারিয়েতের বিভিন্ন অংশের ওপর এবং কৃষক জনগোষ্ঠীর ওপর ধর্ম তার প্রভাব বহাল

www.pathagar.com

রাখতে পারে? কারণ, জনগণের অজ্ঞতা। এই উত্তরটা দেয় প্রগতিবাদী বুর্জোয়া বস্তুবাদী। অতএব, 'ধর্ম নিপাত যাক আর নাস্তিক্যবাদ অমর হোক'; নাস্তিক্যবাদের প্রচারই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কাজ! মার্ক্সবাদ বলে, মিথ্যা কথা, এটা হচ্ছে বাইরে থেকে আলগা-পাতলা দেখার ধরন, বুর্জোয়া দরদীদের পিটপিটে চোখের দোষ। এগুলো ধর্মের গোড়া সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ গভীর কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। ব্যাখ্যাটা বস্তুবাদী পদ্ধতি দিয়ে নয়, দেয়া হচ্ছে ভাববাদী কায়দায়।[২৫]

ধর্মের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা এসেছে মূলত ফয়েরবাখ সংক্রান্ত মার্ক্সের থিসিসে। সেই জার্মান বস্তুবাদ আর ভাববাদের জটিল সমালোচনায় আর মনোহর দার্শনিক ব্যাখ্যায় মার্ক্স যে নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন সেটা এমনকি একজন ধর্মবাদীরও বিপুল আগ্রহের উৎস হতে পারে। মার্ক্সের সেই দার্শনিক আলোচনার মর্ম বাঙালি বামপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

[২৫] Lenin, *Collected Works*, Vol. 15, Progress Publishers, 1973, Moscow, pp. 402-413

www.pathagar.com

পাঁচ

মার্ক্সবাদ কোন্ বস্তুবাদ?

বস্তুবাদ মানেই মার্ক্সবাদ নয়। মার্ক্সবাদ এটার বাইরেও অন্য কিছু। মার্ক্সবাদ বস্তুবাদকে অতিক্রম করে যায়। মার্ক্সবাদকে কেন বিশুদ্ধ বস্তুবাদ হিসেবে দেখা হয়? কারণ, এই ভ্রান্তির উৎস মার্ক্সের পরে মার্ক্সের অনুসারীদের উদ্ভাবিত কিছু টার্মে। মার্ক্স তাঁর লেখায় 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' বা 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' শব্দগুচ্ছ ঘুণাক্ষরেও কোথাও উল্লেখ করেননি। এই শব্দগুচ্ছ মার্ক্স অনুসারীদের বিনির্মাণ। এই বিনির্মাণে অবশ্য এঙ্গেলসও ভূমিকা রেখেছেন। তবে কথাগুলো মার্ক্সের নয়, এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। মার্ক্স পর্যালোচনার জন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা বলেছেন।

মার্ক্স ভাববাদ এবং বুর্জোয়া বস্তুবাদ (বিশেষ করে তাঁর তাত্ত্বিক গুরু ফয়েরবাখকে) একইসাথে আক্রমণ করেছেন। মার্ক্সের তত্ত্ব ফয়েরবাখকে অতিক্রম করে মার্ক্সবাদ হয়েছে। বস্তুবাদী হওয়া আর মার্ক্সবাদী হওয়া এক কথা নয়। এই আপাত জটিল জট খুলতে হলে আমাদের হেগেল থেকে শুরু করতে হবে। মার্ক্স এবং ফয়েরবাখ দুজনই হেগেলের সমালোচনা করেছিলেন একই ভাষায়, একই যুক্তি ব্যবহার করে। বিভ্রান্তি র শুরু এখান থেকেই।

হেগেল বলেছিলেন, মূল হচ্ছে ভাব, বস্তু নয়। যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্যমান সবই হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ। বস্তুর বদলে বস্তুর গুণ হচ্ছে আদি এবং সেই গুণ একটি স্বাধীন সত্তা, যা থেকেই এই সত্তার

www.pathagar.com

উন্নত স্তরে বস্তু প্রকাশিত হয়। ধরুন, রসগোল্লা মিষ্টি। হেগেলের মতে, আপনাকে ধরতে হবে মিষ্টতা রসগোল্লার গুণ নয়, বরং মিষ্টতা একটা রসগোল্লা থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন সত্তা, যে সত্তা একটা উন্নত স্তরে রসগোল্লার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে।[২৬]

ফয়েরবাখ বলেন, হেগেলের দর্শনে এই উদ্দেশ্য (বস্তু) আর বিধেয় (বস্তুর গুণ) উল্টে গিয়েছে। তিনি সত্যিকারের মানুষকে কর্তা বা বিষয় আকারে ধরে না নিয়ে বিষয়ের বিধেয় অর্থাৎ 'চিন্তা'কেই কর্তা বা বিষয় ধরে নিয়েছেন। এবার হেগেল সম্পর্কে মার্ক্সের সমালোচনা দেখি:

> হেগেল বিধয়কে, উদ্দেশ্যের বিষয়কে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিন্তু কর্মটা তিনি করেন তাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্থাৎ তাদের স্বরূপ থেকে আলাদা করে নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে আসল রূপের আবির্ভাব ঘটে এই কারবারের ফল হিসেবে, অথচ দরকার ছিল বিষয়ের স্বরূপ থেকেই শুরু এবং তার মূর্তায়ন প্রক্রিয়া বিবেচনা। কাজে কাজেই রূপ ধারণ করে হাজির হয় এক রহস্যময় সত্তা, আর আসল সত্তা হয়ে ওঠে অন্য কিছু। বলা যায়, হয়ে ওঠে সেই রহস্যময় সত্তার মুহূর্ত; যেহেতু হেগেলের শুরু আসল অস্তিত্ব থেকে নয়, সর্বজনীন সত্যের বিধেয়বাচনগুলোর একটি আশ্রয় দরকার, রহস্যময় ব্রহ্মজ্ঞান (idea) হয়ে ওঠে সেই রহস্যময় আশ্রয়।[২৭]

এবার দেখি ফয়েরবাখ কী বলেছিলেন। হেগেলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, বস্তু প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চেতনা হিসেবে নিজেকে বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ ফয়েরবাখ শুধু হেগেলকে উল্টে দিয়েছেন। বস্তুর জায়গায় চেতনা বসিয়েছেন আর চেতনার জায়গায় বস্তু বসিয়েছেন। ফয়েরবাখের আরম্ভবিন্দু ছিল হেগেলের মানব সারসত্তাকে আত্মচৈতন্যে পর্যবসিত করার অস্বীকৃতি। অতিন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে ফয়েরবাখের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। এটাই হচ্ছে জার্মান বস্তুবাদের মূলকথা। এই বস্তুবাদকে মার্ক্স 'ইতরোচিত বস্তুবাদ' বলে নাচক করে দিয়েছিলেন।

মার্ক্স কেন সেই বস্তুবাদ নাচক করেছেন? যখন কোনো বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করি তখন আমার এবং বস্তুর মধ্যে একটা সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সপ্রাণ, কারণ এটা জীবতাত্ত্বিকভাবে

---

[২৬] ভাব ও বস্তুর এই ব্যাখ্যাটি ফরহাদ মজহারের 'মোকাবিলা' গ্রন্থের আলোচনা অবলম্বনে কৃত।

[২৭] Karl Marx, *Early Writings*. trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton, Vintage Books, 1975, Newyork, p. 80

www.pathagar.com

নির্ধারিত বা বায়োলজিক্যালি ডিটারমাইন্ড; আর সক্রিয়, কারণ এটা স্থান-কাল দিয়ে সীমাবদ্ধ। বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা সেই সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্কের ফল। যদি এই সক্রিয় সম্পর্কের দিক দিয়ে বস্তু এবং দ্রষ্টার বিচার না করি তবে হয় বস্তুর দিক থেকে অথবা দ্রষ্টার দিক থেকে দেখতে হবে। তাহলেই সবকিছু সাজেক্ট এবং অবজেক্টের দিক থেকে ভাগ হয়ে যাবে। যিনি দ্রষ্টার জায়গা থেকে বিষয়টিকে দেখেন তিনি হন ভাববাদী আর যিনি বস্তুর দিক থেকে দেখেন তিনি হয়ে যান বস্তুবাদী। মার্ক্স এই দুই ধারার বিরোধী। তিনি বিষয়কে দেখেন সেই সপ্রাণ ও সক্রিয় সম্পর্কের দিক থেকে। ঠিক এই জায়গায় এসে বাঙালি বামপন্থী খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ভ্রান্তভাবে ফয়েরবাখের দর্শনকেই মার্ক্সবাদ বলে ভুল জেনে এসেছেন।

এবার দেখা যাক ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুই ধারাকে মার্ক্স কিভাবে সমালোচনা করেছেন? এটা স্পষ্ট হবে যদি আমরা ফয়েরবাখ সম্পর্কে মার্ক্সের এক নম্বর থিসিসটি দেখি:

> ফয়েরবাখের বস্তুবাদসহ আগের (অর্থাৎ মার্ক্সের আগের) সব বস্তুবাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে তাতে বস্তু, বাস্তবতা বা ইন্দ্রিয়োপলব্ধি কেবল নৈর্ব্যক্তিক বিষয় (object) রূপে বা ভাবাভাবির ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের ইন্দ্রিয়ের কায়কারবার, বৈষয়িক চর্চা হিসেবে দেখা হয়নি, কর্তাব্যক্তির দিক থেকে আমলে নেওয়া হয়নি। কাজে কাজেই বস্তুবাদের উলটো ধারা হয়ে সক্রিয় দিকটি অমূর্ত কায়দায় বিকশিত হয়েছে ভাববাদে – যে ভাববাদ বস্তুময়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্মকাণ্ড কী জিনিস ঠিক জানে না। ফয়েরবাখ চান ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্মকাণ্ডকে ভাবাভাবির বিষয় থেকে সত্যিসত্যিই আলাদা করতে, কিন্তু খোদ মনুষ্যমূলক কায়কারবারকে তিনি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় বলে ধরেন না। অতএব 'স্পিরিট অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' বইটিতে তিনি একমাত্র তত্ত্বচর্চার জায়গাটিকেই খাঁটি মানুষের মতো কাজ বলে মানেন; অন্যদিকে মানুষের ইন্দ্রিয়পরায়ণ সক্রিয়তাকে শুধু ইহুদি দোকানের নোংরা কায়কারবার বলেই গণ্য করেন এবং সে-রকমই স্থিরবদ্ধ করে তোলেন। তাই তিনি 'বৈপ্লবিক' 'ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক পর্যালোচনামূলক' কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না।[২৮]

এছাড়া ফয়েরবাখ যে ধর্মের বিচার সামাজিকভাবে উপস্থিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন সেটাও মার্ক্স ফয়েরবাখ সংক্রান্ত সাত নম্বর থিসিসে স্পষ্ট করেছেন এভাবে:

---

[২৮] Karl Marx and Fredarikh Engels, *The German Ideology*, International Publishers, p. 121

www.pathagar.com

> ধর্মীয় অনুভূতি যে সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফল, কাজে কাজেই ফয়েরবাখ এই দিকটা দেখতে ব্যর্থ হন এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিকে তিনি বিশ্লেষণ করেন সে যে একটি বিশেষ ধরনের সমাজের অন্তর্গত সেটা আর তার নজরে পড়ে না।[২৯]

মার্ক্সবাদ যে ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে অতিক্রম করে যায় লেনিনও সেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এভাবে:

> মার্ক্সবাদ হচ্ছে বস্তুবাদ। সেদিক থেকে আঠারো শতকের এনসাইক্লোপেডিস্ট অথবা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মতোই ধর্মের মোকাবিলায় মার্ক্সবাদ অবিরাম খড়গহস্ত। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্ক্স আর এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এনসাইক্লোপেডিস্ট আর ফয়েরবাখে থেমে থাকে না, আরো এগিয়ে যায়। কারণ হলো, মার্ক্সবাদ বস্তুবাদী দর্শনটা প্রয়োগ করে ইতিহাসের পরিমণ্ডলে, সমাজবিজ্ঞানের এলাকায়। ধর্মের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, সেটা তো সব বস্তুবাদেরই অ-আ-ক-খ, কাজে কাজেই মার্ক্সবাদেরও। কিন্তু মার্ক্সবাদ সেই বস্তুবাদ নয় যা অ-আ-ক-খ-তেই থেমে যায়। বরং আরো বহুদূর এগোয়। মার্ক্সবাদ বলে, আমাদের জানতে হবে কিভাবে ধর্মের মোকাবিলা করতে হয়। আর তার জন্য জনগণের মধ্যে ধর্ম ও বিশ্বাসের উৎপত্তি কেন হলো, বস্তুবাদী পদ্ধতিতে তার একটা ব্যাখ্যা তাকে পেশ করতে হয়। ধর্ম ও মোকাবিলার ব্যাপারটাকে বিমূর্ত কায়দায় মত-প্রচারের ওয়াজ বানিয়ে ফেললে চলবে না। ধর্মের সামাজিক শেকড় উপড়ে ফেলার জন্যে শ্রেণি আন্দোলনের কংক্রিট চর্চার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে।[৩০]

মার্ক্সের আগে বস্তুবাদ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অভিজ্ঞতাকে বস্তুবাচক বিষয় হিসেবে অনুধাবনের প্রয়োজন বলে মনে করত না। মার্ক্স এটা প্রয়োজন বলে মনে করেন এবং মার্ক্স বস্তু বা দ্রষ্টার জায়গায় না থেকে বস্তু এবং দ্রষ্টার সপ্রাণ ও সক্রিয় সম্পর্কের দিক থেকে বিষয়টিকে বুঝতে চান। তাই মার্ক্সের চিন্তার উত্তরণ ঘটে ইতরোচিত বস্তুবাদ থেকে আরো উন্নত এক স্তরে। ডায়লেকটিক্স আর বস্তুবাদ – দুটো ধারণাই পুরনো। মার্ক্সের হাতে পড়ে এগুলো নতুন অর্থ পেয়েছে। তাদের মর্মবস্তুই গেছে পাল্টে!

---

[২৯] Karl Marx, *Early Writings*, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton, Vintage Books, 1975, Newyork, p. 423

[৩০] Lenin, *Collected Works*, Vol 15, Progress publishers, p. 805

www.pathagar.com

ছয়

মার্ক্স-এর 'আফিম': এর আগে-পরে কি কিছু ছিল?

এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, পৃথিবীতে সব আদর্শকে ব্যবহার করেই নিপীড়ন হয়েছে। তাই ধর্মকে ব্যবহার করেও নিপীড়ন হয়েছে, আবার ধর্মকে অবলম্বন করে নিপীড়িতের লড়াই আর প্রতিবাদও ভাষা পেয়েছে। ধর্ম যখন নিপীড়কের সহায়ক হয়ে যায় তখন বিশ্লেষণ করতে হবে সেটা ধর্মের অন্তর্গত ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা। ধর্মের বিচার করতে হবে সেটাকে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আলোকে। ঐ যে মার্ক্স বলেছিলেন "আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি মানুষ থেকে শুরু হয় না, শুরু হয় বৈষয়িকভাবে হাজির থাকা সামাজিক কালপর্ব বিচার থেকে" – এই কালপর্বের বিচার ছাড়া ধর্মের বিচার অসম্পূর্ণ। কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস বা লেনিন ধর্ম নিয়ে কোনো উন্নাসিক মন্তব্য করেননি। করার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। ধর্ম নিয়ে কমিউনিস্টদের পর্যালোচনা ধর্মের উচ্ছেদ নিয়ে চিন্তার জন্য নয়, বরং মার্ক্সবাদীরা ধর্মের পর্যালোচনা বিরাজমান অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নিপীড়িতের কাতরতার এবং আকুতির জায়গায় দাঁড়িয়ে করে।

এনলাইটেনমেন্ট যখন ধর্মের সাথে রাজনৈতিক ফয়সালা করছে তখন এনলাইটেনাররা ধর্মের নির্দিষ্ট গণ্ডি ঠিক করে দেয়ার পাশাপাশি তারা ধর্মকে হীন এবং ধর্মাচারকে এক নিম্নস্তরের ও প্রতারকদের কাজ বলে

www.pathagar.com

প্রচার করেছিল। কমিউনিস্টরা ধর্ম সম্পর্কে এনলাইটেনারদের প্রচারিত অবস্থান আর বক্তব্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

এঙ্গেলসের একটা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দেখি:

> মধ্যযুগে যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন তাদের আমল থেকে আঠারো শতকের এনলাইটেনারসহ পুরো কালপর্বে ধর্ম সম্পর্কে জোরদার মতটা ছিল এরকম যে, সব ধর্মই, কাজেই খ্রিষ্ট ধর্মটাও, প্রতারকদের ব্যাপার। হেগেল যখন দর্শনের কাঁধে বিশ্ব ইতিহাসের যৌক্তিক ক্রমবিকাশ দেখাবার কাজ গছিয়ে দিলেন তারপর থেকে এইরকম ব্যাখ্যা আর যথেষ্ট বলে পরিগণিত হলো না।[৩১]

এঙ্গেলস এনলাইটেনারদের বক্তব্য এবং ধর্ম সম্পর্কে তাদের অবস্থান গ্রহণ করছেন না স্পষ্টভাবেই। কার্ল মার্ক্সের ধর্ম সম্পর্কে যে বহুল প্রচারিত বাণীটি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিস্ট আর ধর্মকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং বিশেষ করে বঙ্গীয় কমিউনিস্টরা যে তকমা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই নিজের গলায় পরে নিয়েছে সেই লেখাটুকু আমরা পুরোটা পড়তে পারি। পড়ার আগে আমাদের মেডিকেল ও ওষুধবিজ্ঞানের একটা ছোট ইতিহাস জানার প্রয়োজন আছে। ১৮০৪ সালে মার্ক্সের জন্মের মাত্র কয়েক বছর আগে জার্মানিতেই ফ্রেডারিখ স্ট্রুনার আফিম থেকে এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠ ব্যথানাশক আবিষ্কার করেন। মার্ক্সের যুবাবয়স থেকেই চিকিৎসাক্ষেত্রে আফিম শক্তিশালী ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এবার মার্ক্সের সেই লেখা পুরোটা আমরা দেখব যেখানে তিনি আফিমের সাথে ধর্মকে তুলনা করেছিলেন।

> ধর্মহীন সমালোচনার ভিত্তি হচ্ছে : মানুষ ধর্ম তৈরি করে, ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না। আসলেই যে মানুষ এখনো নিজেকে নিজের মধ্যে জয় করে নিতে পারেনি কিংবা যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম হচ্ছে সেই মানুষের নিজের সম্পর্কে চৈতন্য, তার নিজের গৌরবচেতনা। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার বাইরে ল্যাপ্টা মেরে বসে থাকা কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়। মানুষ মানে হচ্ছে মানুষের এই জগৎ, রাষ্ট্র, সমাজ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজই জন্ম দেয় ধর্মকে, যা হলো জগৎ সম্পর্কে মাথা নিচে পা ওপরে ওলটানো চেতনা। কারণ জগৎটার আসলেই মাথা নিচে, পা ওপরে তোলা। ধর্ম হলো এই জগতেরই সাধারণ তত্ত্ব, এর বিশ্বকোষ; এই জগতেরই লোকপ্রিয় যুক্তিতর্ক, এর

---

[৩১] Marx and Engels, 'Bruno Bauer and Early Christianity', *On Religion*, Progress Publishers, 1966

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক মর্যাদা, এর জোশ, এর নৈতিক আদেশ, পরিপূরক আচার-অনুষ্ঠান, সান্ত্বনা ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সর্বজনীন ভিত্তি। এটা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত মর্মার্থের ভূতুড়ে বাস্তবায়ন কারণ মানুষের মর্ম সদর্থক কোনো সত্য অস্তিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সে-কারণে পরোক্ষ সেই জগতেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম যার আধ্যাত্মিক সুগন্ধ হচ্ছে ধর্ম।

ধর্মের মর্মযাতনা অতএব বাস্তবের সেই একই আর সমান যাতনার অভিব্যক্তি, বাস্তবে কষ্ট পাওয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। ধর্ম হচ্ছে নির্যাতিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। এটা হচ্ছে জনগণের জন্য আফিম।

জনগণের মায়াবি সুখস্বপ্ন হিসেবে ধর্মের বিলোপ হচ্ছে বাস্তবিক সুখের দাবি। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে মায়ার ঘোর ছুড়ে ফেলার জন্য জনগণকে ডাক দেওয়ার মানে সেই অবস্থা মায়াচ্ছন্নতাকে আবশ্যক করে তোলে। অতএব ধর্মের পর্যালোচনা মানে চোখের-জলে ভাসা সেই উপত্যকার পর্যালোচনা ভ্রূণাকারে আরম্ভ করা, ধর্ম যার চারদিকে জ্যোতির্ময় মণ্ডল হয়ে রয়েছে।[৩২]

এবার এই লেখা থেকে মর্মশাঁসটা বের করার চেষ্টা করা যাক। ধর্ম মানুষের নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বজগতের সাথে তার নিজের সম্পর্কের প্রথম দার্শনিক উপলব্ধি। মানুষ কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়। সেই মানুষকে বুঝতে হলে যে নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈষয়িক পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ বাস করে তার আলোকে বুঝতে হবে।

ধর্ম কোনো বিশেষ মানুষের সৃষ্টি বলে নাস্তিককুল যে প্রচারণা করে মার্ক্স সেটার সাথে একমত নন। তিনি ধর্মকে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি বা দলের মধ্যে একটি নতুন চেতনার উন্মেষ হিসেবে দেখেন এবং সেই বিশেষ চেতনা সমাজচেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণেই ধর্ম হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং কালোত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকে।

নাস্তিকেরা যেহেতু মনে করে ধর্ম ব্যক্তির মাথা থেকে এসেছে, তাই ধর্মকে আক্রমণ মূলত ধর্ম-প্রবর্তকের ওপর আক্রমণে পর্যবসিত হয়। ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের প্রমাণ করতে হয়, ধর্ম-প্রবর্তক একজন প্রতারক। কমিউনিস্টরা ধর্ম-প্রণেতাদের প্রতারক মনে করে না।

---

[৩২] Karl Marx, *Early Writings*, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton. Vintage Books, 1975, New york p. 244

www.pathagar.com

বরং সকল ধর্ম-প্রচারককে ইতিহাসের সেই কালপর্বে অনন্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে।

ধর্ম এই জগতের চেতনা, যা ওল্টানো একটা জগৎ। জগৎ ওল্টানোর জন্য সেই জগতের চেতনাও ওল্টানো। চেতনার এই উল্টে থাকাটা চেতনার সমস্যা নয়, সমস্যা উল্টে থাকা জগতের।

এই উল্টে থাকা জগতের সমালোচনা না করে সেই জগতের উল্টে থাকা চেতনার সমালোচনা করা একটা নির্বুদ্ধিতা। মার্ক্স জার্মানিতে সেই বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের সমালোচনায় লিখেছিলেন,

> কোনো এককালে একজন ভালো মানুষের মনে হলো মানুষ জলে ডোবে, কারণ তাদের মাথা অভিকর্ষের তত্ত্বের বোঝায় ভারি হয়ে আছে। যদি ঐ ধারণাটি, ধরা যাক, কুসংস্কার বা ধর্মীয় ধারণাটি তাদের মাথা থেকে বের করে দেয়া যায় তাহলে তারা চিরকালের জন্য জলের সব বিপদ থেকে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। সারাটা জীবন সে অভিকর্ষের মায়ার বিরুদ্ধে লড়ল, সমস্ত তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে অভিকর্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে নতুন নতুন বহুমুখী সব প্রমাণ হাজির করল। জার্মানির নতুন বিপ্লবী দার্শনিকেরা ঐ ভালো মানুষটার মতো।[৩৩]

এই নির্বোধেরা বোঝাতে চায়, ধর্মই সকল জাগতিক দুর্দশার জন্য দায়ী। তাই তারা মনে করে এই ধর্মের সবলে উচ্ছেদই সমস্যার সমাধান দিতে পারে। সমাজের দৃষ্টি ভুল দিকে নিবদ্ধ করার জন্য মার্ক্স এই নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকদের অভিযুক্ত করেছিলেন। কারণ এর ফলে শোষকশ্রেণিই সরাসরি উপকৃত হয়।

চেতনা যখন ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন তার মধ্যেই মানুষ খুঁজে নিতে চায় তার সকল চিন্তার সারবস্তু। "ধর্ম হলো এই জগতেরই সাধারণ তত্ত্ব, এর বিশ্বকোষ, এই জগতেরই লোকপ্রিয় যুক্তিতর্ক, এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, এর জোশ, এর নৈতিক আদেশ, পরিপূরক আচার-অনুষ্ঠান, শান্ত্বনা ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সর্বজনীন ভিত্তি।" – পুনর্বার মার্ক্স উদ্ধৃত করতে করি। আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি কেন নিপীড়িতের লড়াই ধর্মের রূপ নিয়ে ইতিহাসে বারে বারে আবির্ভূত হয়েছে।

শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ পৃথিবী সম্পর্কে ধর্মীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে। তার আগে নয়। তাই এই সীমাবদ্ধতা

---

[৩৩] কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, জার্মান ভাবাদর্শ

www.pathagar.com

বোঝানোর জন্য কোনো পুস্তক রচনার প্রয়োজন নেই। লেনিন সেটা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, পুঁজিবাদ বিনাশের আগে কোনো শিক্ষা, কোনো গ্রন্থই ধর্মের শিকড় উৎপাটনে সক্ষম নয়। তাহলে কেন এই অর্থহীন শক্তিক্ষয়?

ধর্মের জন্য মানুষের কাতরতা কোনো ভুয়া চেতনা বা বিভ্রান্তি নয়। ধর্ম এই 'হৃদয়হীন জগতের হৃদয়', যা ধর্ম সম্পর্কে সম্ভবত করা কমিউনিস্টদের সবচেয়ে কাব্যিক, শ্রদ্ধামেশানো এবং মর্মস্পর্শী শব্দগুচ্ছ।

ধর্ম এই দুঃখময় জগতের বেদনার নিরাময় ঘটায়, কিন্তু এই নিরাময় সাময়িক, যেমন ব্যথানাশক ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। যে বৈষয়িক অবস্থা এই মায়াময় মুক্তির স্বপ্নকে অনিবার্য করে তোলে সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এই মায়াময় মুক্তির শর্ত অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকে।

মার্ক্স ঘোষণা করেছিলেন:

> জার্মানীতে ধর্মের পর্যালোচনা শেষ হয়েছে এবং ধর্ম সংক্রান্ত পর্যালোচনা যেকোনো পর্যালোচনার পূর্বশর্ত। তাই ধর্মের পর্যালোচনা এক চোখের জলে ভাসা সেই উপত্যকার পর্যালোচনা, ধর্ম যার চারদিকে জ্যোতির্ময় মণ্ডল হয়ে আছে।

মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম সেই জ্যোতির্ময় মণ্ডল, কোনো অশ্রদ্ধার বিষয় অবশ্যই নয়।

www.pathagar.com

সাত

শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি

শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির প্রশ্নে ভাববাদ, বস্তুবাদ, বস্তু আর ভাবের সপ্রাণ সম্পর্ক – এই জট না খুলে নিলে মার্ক্স শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি বলতে কী বুঝিয়েছেন সেটা বুঝতে একটু সংকট হবে। এই মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা জানা বিষয়গুলোকে আবার একটু ঝালিয়ে নিতে পারি।

বস্তুবাদ

দর্শনের সবচেয়ে প্রাথমিক মতবাদগুলোর একটি হলো বস্তুবাদ। আমাদের চারপাশের জগতের যেসব অস্তিত্ব আমরা পর্যবেক্ষণ করি, বস্তুবাদ অনুযায়ী তারা যেকোনো প্রকার চেতনানিরপেক্ষ। যে দার্শনিক ধারায় ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবী বস্তুগত তার অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, চৈতন্যের বাইরে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে; বস্তুই মুখ্য, তা কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি এবং আছে বাহ্যিকভাবে; চৈতন্য, চিন্তন হলো বস্তুরই একটি গুণধর্ম; পৃথিবী ও তার নিয়মগুলো জ্ঞেয়। বস্তুবাদ কথাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রধানত বস্তু সম্পর্কে পদার্থবিদ্যাগত ধারণাগুলোর অর্থে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তা ব্যবহৃত হয়েছে দার্শনিক অর্থে, ভাববাদের বিপরীতে।

ভাববাদ

ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে বস্তুজগতের সবকিছু পরমাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ বস্তুজগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসসহ সকল রকমের পরিবর্তন পরমাত্মা

www.pathagar.com

দ্বারা পরিচালিত। ভাববাদীরা মনে করেন, বস্তু ও শক্তি দুটো ভিন্ন জিনিস। বস্তু জড়বিশেষ, কিন্তু শক্তি একটি অবস্তুগত জিনিস। শক্তি যখন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তখনি বস্তু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে জীবন জীবকোষের কোনো গুণ বা ধর্ম নয়। পরমাত্মা থেকে আসা একটি অলৌকিক ও অবস্তুগত শক্তি।

প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব অনুসারে চেতনা বা মন পরমাত্মা থেকে আসা কোনো অলৌকিক ও অবস্তুগত শক্তি নয়; বরং মস্তিষ্ককোষ থেকে আসা বস্তুগত একটি গুণ বা ধর্মবিশেষ। তাই মস্তিষ্ক বিলীন হবার সাথে সাথেই মন বা চেতনার চির অবসান ঘটে। অন্যদিকে ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে মস্তিষ্ককোষের অবসান হবার সাথে সাথে মন বা চেতনার চির অবসান ঘটে না, স্থানান্তরিত হয় মাত্র। ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে মানুষের দেহের মধ্যে আত্মা নামক অবস্তুগত একটি অবিনাশী অস্তিত্ব আছে। মানুষের দেহের অবসানের পরেও আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

এবার বস্তু এবং চেতনা এই দুটোর সম্পর্ক নিয়ে করা আমাদের পূর্বতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পঞ্চম পর্বে এ বিষয়ে কিছুটা বলা হলেও বুঝে নেওয়ার সুবিধার্থে আমরা আবার আলোচনা করতে চাই। যখন কোনো বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করি তখন আমার এবং বস্তুর মধ্যে একটা সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সপ্রাণ, কারণ এটা জৈবিকভাবে নির্ধারিত বা বায়োলজিক্যালি ডিটারমাইন্ড; আর সক্রিয়, কারণ এটা স্থান-কাল দিয়ে সীমাবদ্ধ। বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা সেই সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্কের ফল। যদি এই সক্রিয় সম্পর্কের দিক দিয়ে বস্তু এবং দ্রষ্টার বিচার না করি তবে হয় বস্তুর দিক থেকে অথবা দ্রষ্টার দিক থেকে দেখতে হবে। তাহলেই সবকিছু সাব্জেক্ট এবং অবজেক্টের দিক থেকে ভাগ হয়ে যাবে। যারা দ্রষ্টার জায়গায় থেকে বিষয়টিকে দেখেন তারা হন ভাববাদী আর যারা বস্তুর দিক থেকে দেখেন তারা হয়ে যান বস্তুবাদী। মার্ক্স এই দুই ধারার বিরোধী। তিনি বিষয়কে দেখেন সেই সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্কের দিক থেকে।

মার্ক্সের ফয়েরবাখ সংক্রান্ত এক নম্বর থিসিসটা যদি আবার দেখি:

> ফয়েরবাখের বস্তুবাদসহ আগের (অর্থাৎ মার্ক্সের আগের – পি.ভ.) সব বস্তুবাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে তাতে বস্তু, বাস্তবতা বা ইন্দ্রিয়োপলব্ধি কেবল নৈর্ব্যক্তিক বিষয় (object) রূপে বা ভাবাভাবির ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়েছে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের কায়কারবার, বৈষয়িক চর্চা হিসেবে দেখা হয়নি, কর্তাব্যক্তির দিক থেকে আমলে নেওয়া হয়নি। কাজে কাজেই বস্তুবাদের উলটো ধারা হয়ে সক্রিয় দিকটি অমূর্ত কায়দায় বিকশিত হয়েছে ভাববাদে

www.pathagar.com

– যে ভাবাবাদ বস্তুময়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্মকাণ্ড কী জিনিস ঠিক জানে না। ফয়েরবাখ চান ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্মকাণ্ডকে ভাবাভাবির বিষয় থেকে সত্যি সত্যিই আলাদা করতে, কিন্তু খোদ মনুষ্যমূলক কায়কারবারকে তিনি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় বলে ধরেন না। অতএব 'খ্রিষ্ট ধর্মের মর্মবস্তু' বইটিতে তিনি একমাত্র তত্ত্বচর্চার জায়গাটিকেই খাঁটি মানুষের মতো কাজ বলে মানেন; অন্যদিকে মানুষের ইন্দ্রিয়পরায়ণ সক্রিয়তাকে শুধু ইহুদি দোকানের নোংরা কায়কারবার বলেই গণ্য করেন এবং সে রকমই স্থিরবদ্ধ করে তোলেন। তাই তিনি 'বৈপ্লবিক', 'ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক পর্যালোচনামূলক' কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না।[৩৪]

মার্ক্স প্রস্তাবিত 'খোদ মনুষ্যমূলক কায়কারবার' – এটা কী? এটাই বস্তু আর দ্রষ্টার সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্ক, এটা শ্রমিকের ইচ্ছা আর সংকল্পের সঙ্গে জগতের সক্রিয় সম্পর্ক। এটাকেই মার্ক্স উৎপাদন-সম্পর্ক বলে পরবর্তী সময়ে অভিহিত করেছেন। চেতনা ও দেহ অভিন্ন হয়ে সক্রিয় উৎপাদনের মধ্য দিয়ে নিজেরই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শর্ত তৈরি করছে। এই বোধেই আসে শ্রমিকের মুক্তি। শ্রমিকের মুক্তি হচ্ছে মন ও দেহের অবিচ্ছিন্ন সপ্রাণ ও সক্রিয় অবস্থার উপলব্ধি। যেখানে ভাববাদ আর বস্তুবাদ উভয়ই বিলয় হয়। আমরা দেখি মার্ক্স কী বলেছেন, কখন শ্রমিক সত্তা স্বাধীন। একটি সত্তা নিজেকে স্বাধীন গণ্য করতে পারে যদি সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শেখে। এবং সে নিজের পায়ে নিজে কেবল তখনই দাঁড়াতে পারে যখন সে নিজের অস্তিত্বের জন্য তার নিজের কাছেই ঋণী। একজন মানুষ যখন অন্যের গুণেই নির্ভরশীল সত্তা বলে গণ্য করে। কিন্তু আমি অন্যের গুণেই আগাগোড়া বাঁচি যদি আমার জীবন তার ওপর নির্ভরশীলই শুধু নয়, আমার জীবনও যদি তার সৃষ্টি বলে গণ্য করি; যদি তাকেই আমার জীবনের উৎস বলে মানি। অনিবার্যভাবেই আমার জীবন নিজের বাইরে নিজের ভিত্তি খুঁজে বেড়ায়, যদি আপন জীবন তার নিজেরই সৃষ্টি না হয়। সৃষ্টি তাহলে এমন একটা ধারণা যার ভূত লোকায়ত চেতনা থেকে তাড়ানো সত্যিই কঠিন। মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গে আপনা-আপনি সক্রিয় – এই ধরনের কোনো ব্যাপার সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে না। কারণ প্রতিদিনের কাজকর্মে যেসব প্রমাণ তার ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে তার সঙ্গে এই ধরনের ব্যাপার মেলে না।[৩৫]

---

[৩৪] মার্ক্স-এঙ্গেলস, পৃ. ১২১

[৩৫] Karl Marx, *Early Writings*, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton, Vintage Books, 1975, Newyork, p. 356

www.pathagar.com

মানুষ প্রকৃতিরূপে নিজেই নিজের স্রষ্টা। শ্রমিক-সত্তার মধ্যে প্রকৃতি আর মানুষ একাকার হয়ে যায়। শ্রমিক এই উপলব্ধির ফলে শ্রেণি হিসেবে নিজেকে বিলয় করেই মুক্তি লাভ করে। মার্ক্স যে অবস্থাকে বলেছেন Emancipation of Proletariate। আমরা আবার ফিরে আসি সেই দ্রষ্টা ও বস্তুর সপ্রাণ ও সক্রিয় সম্পর্কের দিকে। যিনি দ্রষ্টার জায়গায় থেকে বিষয়টিকে দেখেন তিনি হন ভাববাদী, আর যিনি বস্তুর দিক থেকে দেখেন তিনি হয়ে যান বস্তুবাদী। ভারতীয় দর্শনে এটাকে বলা হয়েছে 'পুরুষ' আর 'প্রকৃতি'। পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য বা চেতনা, আর প্রকৃতি হচ্ছে বস্তু বা বিশ্ব-প্রকৃতি। আর পুরুষ ও প্রকৃতির সপ্রাণ সম্পর্ক হচ্ছে 'লীলা'। প্রকৃতি আর পুরুষের সপ্রাণ সম্পর্ক বুঝতে পারাটাই হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি তখনই, যখন স্রষ্টা হিসেবে নিজেকেই নিজে চিহ্নিত করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক অভেদ হয়ে যায়।

এঙ্গেলসও ঠিক এই জায়গায় ধরেছেন। প্রকৃতিতে আবার বিলয় হবে মানুষ সেটাই দেখাচ্ছেন এঙ্গেলস:

> In particular, after the mighty advances made by the natural sciences in the present century, we are more than ever in a position to realise, and hence to control, also the more remote natural consequences of at least our day-to-day production activities. But the more this progresses the more will men not only feel but also know their oneness with nature, and the more impossible will become the senseless and unnatural idea of a contrast between mind and matter, man and nature, soul and body, such as arose after the decline of classical antiquity in Europe and obtained its highest elaboration in Christianity.[৩৬]

অর্থাৎ অনুবাদ করলে এটা হবে:

> বর্তমান শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের দুরন্ত অগ্রগতির পরে এমনকি আমাদের দৈনন্দিন কার্যগুলোর সুদূরতর প্রাকৃতিক ফলাফলগুলো বোঝার এবং সুতরাং নিয়ন্ত্রণ করার অভূতপূর্ব অবস্থায় পৌঁছেছি। কিন্তু এটা যতই এগোবে ততই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা কেবল অনুভব করবে না, বুঝতেও পারবে, এবং ততই মন ও বস্তুর, মানুষ ও প্রকৃতির, আত্মা ও দেহের মধ্যে অর্থহীন ও অস্বাভাবিক বৈপরীত্যের যে ধারণাটি, যা ইউরোপে ধ্রুপদি

[৩৬] ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, এপ থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা

www.pathagar.com

প্রাচীনকালের অবনতির পরে উদ্ভূত হয়েছিল ও খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে বিশদতম রূপ লাভ করেছিল, তা আরও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সুফি মতাদর্শেও আমরা দেখি শরিয়ত বা আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত পথে অনুভূতি বা উপলব্ধির (তরিকতের) মাধ্যমে ঈশ্বর-সন্নিধানে যাবার সাধনাই সুফিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার (ফানা) ধক্ষংসসাধন এবং ঈশ্বরের স্বরূপে উপস্থিতি (বকাবিল্লা)।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, মার্ক্সের জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্ক্স দার্শনিকভাবে যা বুঝেছেন সেটাই এই নিরক্ষর সুফিরা বুঝেছেন। বুঝেছেন আমাদের লালনও। শুধু আমরা উন্নাসিক বাঙালি বিপ্লবীরা 'শ্রেণির বিলয়' বুঝতে লেজেগোবরে করে ফেলেছি। বিষয়টা আমরা পরে আবার আসবো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এবার আগের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। কেন ধর্মের পর্যালোচনা জরুরি সেটা ফয়েরবাখের সমালোচনায় মার্ক্স নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, ১. ইতিহাসের প্রক্রিয়া থেকে মানুষকে বিমূর্তভাবে বিচার করতে ও ধর্মীয় অনুভূতি যেন আপনাতে হাজির একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপারে তেমনিভাবে ভাবতে, এবং একটি বিমূর্ত-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষকে অনুমান করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এবং ২. মনুষ্যত্ব (essence) অতএব একধরনের জাতি (genus) ধারণা, মানুষের ভেতরকার একধরনের নির্বাক সর্বজনীনতা, যা কিনা প্রাকৃতিকভাবে অনেক মানুষের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে শুধু এভাবেই তাহলে ব্যাপারটিকে ভাবতে হয়।[৪১]

ওপরের কথার সূত্র ধরে সাত নম্বর থিসিসে মার্ক্স বলছেন,

> ধর্মীয় অনুভূতি সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফল, কাজে কাজেই ফয়েরবাখ এই দিকটা দেখতে ব্যর্থ হন এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিকে তিনি বিশ্লেষণ করেন সে যে একটি বিশেষ ধরনের সমাজের অন্তর্গত সেটা আর তার নজরে পড়ে না।[৪২]

প্রাচ্যে কি ধর্মের পর্যালোচনা হয়েছে? এই কাজটা কি ধর্মবাদীরা করে দেবেন নাকি বিপ্লবী রাজনীতি যারা করেন তাদের করতে হবে? মার্ক্সের ফয়সালা, এই কাজটি না করলে বিপ্লবী রাজনীতির পূর্বশর্ত তৈরি করা যায় না। অসংখ্য সময় এই ভূখণ্ডে বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি হলেও কেন বামপন্থীরা বিপ্লব করতে পারেনি সেই প্রশ্নের উত্তর কি এখানেও আছে?

---

[৪১] মার্ক্স, ১৯৭৫, পৃ. ৪২৩

[৪২] মার্ক্স, ১৯৭৫, পৃ. ৪২৩

www.pathagar.com

নয়

ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে মার্ক্স

ধর্মের বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে জগৎ সেই জগতের জন্মও একই আধারে, একই প্রক্রিয়ায়। "আসলেই যে মানুষ এখনো নিজেকে নিজের মধ্যে জয় করে নিতে পারেনি কিংবা যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম হচ্ছে সেই মানুষের নিজের সম্পর্কে চৈতন্য, তার নিজের গৌরবচেতনা।" মানুষ নিজের থেকে বিচ্যুত হয়ে ধর্মের জগৎ তৈরি করে। সেটাকেই মার্ক্স বলেছেন আত্মবিচ্যুতি। এই আত্মবিচ্যুত জায়গা থেকে যে আরেকটা জগৎ তৈরি হয় সেটা ধর্মনিরপেক্ষতার জগৎ। মার্ক্সের মতে, সেই ধর্মনিরপেক্ষ জগৎও আসলে ধর্মের মতোই আরেকটা আত্মবিচ্যুত জগৎ। এ বিষয়ে ফয়েরবাখ-সংক্রান্ত মার্ক্সের ৪ নম্বর থিসিস আমরা দেখতে পারি :

> ফয়েরবাখ ধর্মীয় আত্মবিচ্যুতির জায়গা থেকে শুরু করেন; শুরু করেন দুনিয়ায় একদিকে ধর্মীয় জগৎ আর অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ জগৎ – এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া থেকে। তার কাজ হলো ধর্মের জগৎকে তার ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির মধ্যে মীমাংসা করা কিন্তু সেই ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিও নিজের কাছ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সেই উঁচু মেঘের মধ্যেই নিজেকে একটি স্বাধীন জগৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যাকে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ভেতরকারই ফাটল আর স্ববিরোধিতা দিয়েই শুধু ব্যাখ্যা করা যায়। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার নিজের জায়গা থেকে বুঝতে হবে তার নিজেরই স্ববিরোধিতা দিয়ে এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিকতার

www.pathagar.com

> স্তরে বদলিয়ে – দুই দিক থেকেই। অতএব, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি পার্থিব পরিবারই পবিত্র পরিবারের (holy family) আসল সত্য বলে আবিষ্কৃত হয় তাহলে কাজ হলো পার্থিব পরিবারকেই তত্ত্বে ও চর্চায় ধ্বংস করা।[৪৩]

পশ্চিমা এনলাইটেনমেন্ট যে ধর্মনিরপেক্ষতার জগৎ সৃষ্টি করল সেটাকে মার্ক্স ধর্মের প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালা বলে মানেননি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরা বাংলাদেশে চূড়ান্ত প্রগতিশীলতা বলে মানি। যারা নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেন তারা কখনো প্রশ্ন করে দেখেননি ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে ইউরোপীয় বয়ানে মার্ক্সের কোথায় সমস্যা ছিল। মার্ক্স বুঝতে ভুল করেননি যে, যে-ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাত ধরে এনলাইটেনমেন্ট আর কার্যকারণ বা এইজ অব রিজনের যুগ, সেই একই হাত ধরেই এসেছে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ। এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবেরও ফ্যাসিস্ট রূপান্তর ঘটেছে।

তাহলে ঠিক কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতার সেই স্ববিরোধিতা? সেটা খুঁজতে আবার মার্ক্সের কাছে যেতে হবে। মার্ক্স সেটাও বলেছেন ফয়েরবাখ সংক্রান্ত আরেক থিসিসে।

> ফয়েরবাখ ধর্মীয় সত্তাকে মানুষের মনুষ্যত্বে নিরসন করেছেন। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব এক একজন মানুষের অন্তর্গত কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। বাস্তবে এটা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের সমাবেশ।[৪৪]

এই সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকেই বিচার করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি। এখানেই মার্ক্সের দর্শনের প্রয়োগ। আবার আমরা দেখি : "যারা দ্রষ্টার জায়গায় থেকে বিষয়টিকে দেখেন তিনি হন ভাববাদী আর যিনি বস্তুর দিক থেকে দেখেন তিনি হয়ে যান বস্তুবাদী।" মার্ক্স এই দুই ধারার বিরোধী। তিনি বিষয়কে দেখেন সেই সপ্রাণ এবং সক্রিয় সম্পর্কের দিক থেকে। এই সপ্রাণ সামাজিক সম্পর্কের সমাবেশের মধ্যেই খুঁজতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ আর ধর্মের জগতের উত্তরণ। ধর্মের জগৎ হয়ে উঠেছে প্রকৃত অর্থে হেগেলের ভাবের জগৎ আর ধর্মনিরপেক্ষতা হয়ে উঠেছে ফয়েরবাখের বস্তুর জগৎ। সেই দুই জগতের

---

[৪৩] মার্ক্স, ১৯৭৫, পৃ. ৪২২

[৪৪] Karl Marx, *Thesis on Foyerbakh*

www.pathagar.com

সাথেই লড়াই করেছেন খোদ মার্ক্স। মার্ক্স বলেছিলেন, "আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি মানুষ থেকে শুরু হয় না, শুরু হয় হয় বৈষয়িকভাবে হাজির থাকা সামাজিক কালপর্ব বিচার থেকে।"

বৈষয়িকভাবে যে-সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ জগৎ তৈরি হলো সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই এই প্রশ্নের সমাধান আছে।

যে-সামাজিক সম্পর্ক ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ জগতের বৈষয়িক শর্ত সৃষ্টি করে সেটার বিলয়েই আত্মবিচ্যুতির জগতের সমাপ্তি ঘটবে। এটাই মার্ক্সের ফয়সালা। মার্ক্সবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতার জগৎকে অতিক্রম করে যান। ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্ট মার্ক্সবাদী বা কমিউনিস্টের গন্তব্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

দশ

বুখারিনের ভ্রান্ত মার্ক্সবাদ পাঠ এবং গ্রামসি'র ব্যাখ্যা[৪৫]

ভ্রান্তভাবে মার্ক্স পাঠ ও ব্যাখ্যার দায় শুধু ভারতবর্ষীয় বামপন্থীদের নয়। এটার শুরু মূলত রাশিয়ায়। বুখারিনের লেখা 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে বই এবং 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ' নামের প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই এই ভ্রান্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। মার্ক্সের নামে তাত্ত্বিক গোঁড়ামির বা মতান্ধতার অনেক জট বুখারিনের লেখা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যেই শুরু হয়েছে। গ্রামসি এটা বুঝতে ভুল করেননি যে, মার্ক্সবাদের বিচ্যুতিকে রুখতে হলে বুখারিনের লেখাকেই শুরুতে ধরতে হবে। গ্রামসি যখন বুখারিনের বিরুদ্ধে কলম ধরছেন তখন বুখারিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শীর্ষ নেতা।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের তত্ত্ব যে বুখারিন বুঝতে পারেননি সেটা দেখিয়ে দিয়ে গ্রামসি বলেছেন, "তিনি ডায়লেকটিক তত্ত্বের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝেন না, তিনি ডায়লেকটিক তত্ত্বকে চেতনার নীতি, ইতিহাসের সারবস্তু এবং রাজনীতির বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত করে আনুষ্ঠানিক তর্কশাস্ত্রে এবং বিদ্যাবাগীশতার 'অ-আ-ক-খ'তে পরিণত করেছেন।"

[৪৫] ভবানি সেন, 'মহা মনীষী গ্রামসি' (প্রবন্ধ); Modern Price and Other writings, Gramsci

www.pathagar.com

'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বইতে বুখারিন ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাববাদ (Subjective Idealism)-এর সমালোচনা করেছেন। বুখারিন লিখেছিলেন:

> As a matter of fact, if 'mind' is the basis of all things, what was the state of the case before man existed? There are two possible answers: either we must assume the existence of a certain extra-human, divine spirit of the variety mentioned in the ancient Biblical stories; or, we must assume that the events of ages long past are also the product of my imagination. The first solution leads us to so called objective idealism, which recognizes the existence of an external world independent of 'my' consciousness. The essence of this world is found in its spiritual origin, in God, or in a 'supreme mind' which here takes the place of God, in a 'world will', or in some other such hocus-pocus. The second solution leads us strait into solipsism, through subjective idealism, which recognizes the existence only of spiritual beings, of a number of thinking subjects. It is easy to recognize solipsism as the most consistent form of idealism. But where does idealism find its basis as a matter of fact? Why does it consider the mental beginning to be more primitive and fundamental? For the reason, in the last analysis, that it assumes 'my' data to consist of my sensations only. But if this is the case, I may doubt equally well the existence of a post in the yard, and of any other human being but myself, including my own parents. Thus solipsism commits suicide, for it destroys not only all of idealism in philosophy, but, in the consistent pursuit of its idealistic views, leads to a complete absurdity, to complete insanity, contradicted at every step by the actual practice of men.[৪৬]

অর্থাৎ বাংলা করলে এটা দাঁড়ায়:

> বস্তুত, যদি 'মন' সবকিছুর ভিত্তি হয়ে থাকে তবে মানুষসৃষ্টির পূর্বে মনের কী অবস্থা ছিল? এর দুটি সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে, হয় আমরা প্রাচীন বাইবেলের গল্পে উল্লিখিত একটি অতি-মানুষের ও বিভিন্ন ঐশ্বরিক আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করব, অথবা, মনুষ্য সৃষ্টির আগের দীর্ঘ অতীতের ঘটনাও আমার কল্পনার উপজাত সেটা অনুমান করা আবশ্যক হবে। প্রথম সমাধান আমাদের এই পথে চালিত করে যে 'আমার' চেতনাবহির্ভূত একটি

[৪৬] বুখারিন, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*

www.pathagar.com

> বহিস্থিত-বিশ্বের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, যাকে তথাকথিত অবজেক্টিভ আইডিয়ালিজম বলা যায়। এই দুনিয়ার অস্তিত্বের সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় তার আধ্যাত্মিক উৎসে; ঈশ্বরে, অথবা একটা সুপ্রিম মাইন্ডের মধ্যে, যা এক সময় 'বিশ্ব ইচ্ছার' জগতে ঈশ্বরের স্থান নেয় বা অন্য কোনো ছলনার মধ্যে আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় সমাধান সাবজেক্টিভ আইডিয়ালিজমের মাধ্যমে আমাদের সরাসরি নিয়ে যায় আত্মজ্ঞানবাদের মধ্যে, যা চিন্তাশীল বিষয়গুলোর মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক বস্তুকে স্বীকার করে। আত্মজ্ঞানবাদকে ভাববাদের সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ফর্ম বলে চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু ভাববাদ কোথায় তার ভিত্তি খুঁজে পায়? কেনই-বা তা মন থেকে উৎসারিত কিছুকেই আদিম এবং মৌলিক বলে বিবেচনা করে? শেষ পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, সেটা এই কারণে যে, 'আমার' উপাত্ত শুধু ইন্দ্রিয়জাত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি একইভাবে আমার উঠানে থাকা খুঁটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি, এবং আমি ছাড়া যেকোনো মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করতে পারি, এমনকি আমার পিতা-মাতার অস্তিত্ব নিয়েও সন্দেহ করতে পারি। এইভাবে আত্মজ্ঞানবাদ নিজেই আত্মহত্যা করে, সে শুধু দর্শনে ভাববাদকেই ধক্ষংস করে না, বরং সত্যের পথে ভাববাদের অবিচল অভিযাত্রাকেও অসম্ভব, নিদারুণ পাগলামিতে পর্যবসিত করে, যা পদে পদে মানুষের স্বাভাবিক চর্চার সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

এই বিষয়ের সমালোচনায় গ্রামসি তাঁর দুর্বলতা তুলে ধরে বলেছেন,

> বুখারিন বুঝতে পারেননি, এই সমালোচনায় তিনি বাস্তব সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রহেলিকাবাদের অভিযোগ আসতে পারে।

মানুষের মনের বাইরে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এই কথা প্রমাণ করার জন্য বুখারিন শুধু সাধারণ মানুষের বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাসকেই প্রধান স্থান দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপলাপ করেছেন। বুখারিন বলেন, ইতিহাসে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পূর্বেও জগৎ ছিল, এ থেকে বস্তুই যে আদি তা প্রমাণিত হয়। গ্রামসি বলছেন যে, এই ইতিহাসও তো মানুষের মনের গোচরীভূত ইতিহাস। এমন ইতিহাস কোথায় আছে যা মানুষ তার চিন্তা দ্বারা সৃষ্টি করেনি? একজন মানুষের কাছে যে ইতিহাস বাস্তব সত্য, সমগ্র মানব সমাজের সম্মিলিত চিন্তার কাছে তা বস্তুনিরপেক্ষ ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্য। সুতরাং বুখারিনের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করলে বস্তু শেষপর্যন্ত মনের ওপর নির্ভরশীলই থেকে যায়। তাহলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ সত্যের অস্তিত্ব কী করে প্রমাণিত হয়?

দার্শনিক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা – এই দুয়ের সমবেত ফলস্বরূপ বস্তুর বাস্তবতা প্রতিভাত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হলো মানুষের

www.pathagar.com

সঙ্গে প্রকৃতির দৈহিক মিলনের ফল। দার্শনিক গবেষণা চিন্তা দ্বারা যাচাই করা হয়। এই দুয়ের ফল যখনই মেলে তখনই বস্তুর বাস্তবতা প্রতিভাত হয়। তখন 'র‍্যাশনাল' এবং 'রিয়েল' এই দুয়ের মিলন ঘটে। 'এই দুয়ের সম্বন্ধটি না বুঝলে মার্ক্সবাদ আদৌ বোঝা হয় না।' গ্রামসির মতে, অতীতকালের বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনকে যে রকম তিনি নেহাত মূর্খতার নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন তা মার্ক্সবাদী পর্যালোচনার বিরোধী।

মেকিয়াভেলির প্রিন্স নিয়ে 'মডার্ন প্রিন্সে' আলোচনা করে গ্রামসি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন, অতীতকালের দর্শনের মধ্যেও বর্তমান কালের মার্ক্সবাদের শিকড় নিহিত আছে, সুতরাং সত্যের উৎস তাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। অতীতের কোনো ভাববাদী দর্শন একেবারে মিথ্যা বা মূর্খতার নজির নয়।

www.pathagar.com

এগারো

ধর্মের সাথে বাঙলায় রাজনৈতিক ফয়সালা হবে কিভাবে?

ধর্মের সাথে বাঙলায় রাজনৈতিক ফয়সালা হবে কিভাবে? এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকেই মুখ ফেরাতে পারি। ইসলামের বিজয়ের যুগে সেমেটিক ইসলামকে বাধা দিয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতিগুলো। বাঙলাদেশও ইসলামকে বাধা দিয়েছে; কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহল উদ্দীপক হলো, বাঙলায় এই বাধাবাধিটা সাংঘর্ষিক হয়নি, বরং তা থেকে হয়েছে সমাজসংস্কার আর প্রথম মানবতাবাদী ধারার উদ্ভব। ইসলামের সাথে ইউরোপের বাধাবাধি ছিল সাংঘর্ষিক। সেই সাংঘর্ষিক বাধাবাধিতে কোনো রাজনৈতিক ফয়সালা হয়নি। ইউরোপের সাথে ইসলামের ক্রুসেডের রক্তাক্ত ইতিহাসের বোঝা আজও পশ্চিম এবং প্রাচ্য বয়ে চলছে। কিন্তু বাঙলার বাধাবাধিটা হয়েছে প্রেম ও ভক্তিবাদে। কেউ কেউ সেই বাধাবাধিটাকেই বলেন বাঙলার প্রথম রেনেসাঁ।

ইসলামের আগমনে জন্ম নেয়া একদিকে শ্রীচৈতন্যের হিন্দু ভক্তিবাদ ও অন্যদিকে মুসলিম মরমি সুফী-সাধকদের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বাঙলার গোটা সমাজজীবনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। হিন্দুধর্মের মানবিক সংস্কার হয়েছিল। গোড়াপত্তন হয়েছিল এক নতুন সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির। বাংলাসাহিত্যের জন্য এসেছিল স্বর্ণযুগ। বস্তুত এই সময়কাল থেকেই বাঙালির জীবনে এই উদার সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী ধারা

www.pathagar.com

প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল যার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের হিন্দু-মুসলমান কবিদের রচনায়।

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই

পনের শতকের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের এই অমর বাণীতে পৃথিবী প্রথম শোনে মানবতাবাদের জয়গান। ঠিক একইভাবে সতের শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা'য় এক উদার সমন্বয়ধর্মী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আব্দুল হাকিম নূরনামায় লিখেছিলেন,

য়াল্লা (আল্লাহ) খোদা-গোঁসাই সকল তান
(তাঁর) নাম সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম।

ইসলামের সাথে স্থানীয় ধর্মের মোকাবেলার এবং ফয়সালার রাস্তাই দেখিয়ে দিতে পারে সামগ্রিকভাবে বাঙলার ধর্মের সাথে রাজনৈতিক ফয়সালার রাস্তা। এই ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া জরুরি। বাঙলায় ইসলামের আবির্ভাব আর সমাজে সেই ধর্মের অভিঘাতের ইতিহাস ভুলে আমরা কেউ কেউ অন্যের তৈরি করা বয়ানে বাঙলার ইসলামকে মূল্যায়ন করছি। বিনির্মিত সেই ভুল ইতিহাস আমাদের নয়। ইসলামের অভিঘাতে সতের শতকের বাঙালি সমাজে যে নবজাগরণের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, ধর্মের সাথে ফয়সালার যে রাস্তা খুলে দিয়েছিল, সেই ইতিহাস বাঙালির অবচেতনে আজও বহমান। কারণ আজও বাঙালি সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে দ্বারস্থ হয় বাঙলার ভাবুকতার কাছে। ভাবের সেই অন্তঃসলিলা ধারা প্রবহমান ছিল বলেই আবারও জন্ম নিয়েছেন লালন।

মার্ক্স যে অবস্থাকে বলেছেন Emancipation of Proletariate অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিরূপে নিজেই নিজের স্রষ্টা। শ্রমিক-সত্তার মধ্যে প্রকৃতি আর মানুষ একাকার হয়ে যায়। শ্রমিক এই উপলব্ধির ফলে শ্রেণি হিসেবে নিজেকে বিলয় করেই মুক্তি লাভ করে। আসুন, লালনের সুরে Emancipation of Proletariate খুঁজে দেখি।

আল্লা কে বোঝে তোমার অপার লীলে।
আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে॥
নিরাকারে তুমি নূরী

www.pathagar.com

ছিলে ডিম্ব অবতারি
সাকারে সৃজন গঠলেন ত্রিভুবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে॥
নিরাকার নিগুম্ভর ধক্ষনি
তাই তো সত্য সবাই জানি
আগমের ফুল নিগুমে রাসুল
এসে আদমের কলবে জান হইলে।
আত্মতত্ত্ব জানে যারা
সাঁইর নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
নীরে নিরঞ্জন, অকৈতব ধন
লালন খুজে বেড়ায় বন জঙ্গলে॥

শ্রমিকের মুক্তি তখনই যখন স্রষ্টা হিসেবে তার নিজের আত্ম-উপলব্ধি ঘটবে এক বিপ্লবী অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যেই শ্রেণি হিসেবে তার বিলয় (ফানা) আর আত্ম-উপলব্ধি (বকাবিল্লা), আর মুক্ত মানুষ তখন লালনের সাথে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠবে 'আল্লা কে বোঝে তোমার অপার লীলে। আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে।' সেই ইতিহাসের হাত ধরে বাঙলায় ধর্মের রাজনৈতিক ফয়সালার অতি জরুরি এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে বাংলায় সম্পূর্ণ করে তোলাটাই বাংলার বিপ্লবী কর্তব্য।

www.pathagar.com

বারো

লালন : বাঙলার বিপ্লবী শ্রেণির সাংস্কৃতিক হেজিমনির আশ্রয়

বিপ্লবকে বিনির্মাণ করতে হয় চিন্তার জগতে। ক্যাপিটালিজম যে দার্শনিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ফিলসফিক্যাল আন্ডারপিনিংকে চিন্তার জগতে পরাস্ত করতে না পারলে বিপ্লব হবে না। মার্ক্স সে-জন্যই তাঁর গুরু হেগেলকে পরাস্ত করেছিলেন চিন্তার জগতে, কারণ আমরা আজ যে পুঁজিবাদী বিশ্ব দেখি, যে বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক ভিত্তির উপরে, সেই জগৎকে তৈরি করে দিয়ে গেছেন হেগেল। পুঁজিবাদের সেই দার্শনিক ভিত্তি বা ফিলসফিক্যাল আন্ডারপিনিং-টা কী? মানব সত্তা আর প্রকৃতি আলাদা। তাই মানবের মুক্তি প্রকৃতির উপরে প্রভুত্বে। তাই পুঁজিবাদ এত যুদ্ধবাদী, এত আগ্রাসী, এত প্রকৃতি-বিনাশি। মার্ক্স এটারই পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চিন্তায় বিপ্লবের বিনির্মাণ শুরু হয় কিভাবে সেটা আমাদের পরে আরো বিস্তারিত শিখিয়েছেন গ্রামসি। গ্রামসি দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া সমাজ শুধু অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেই পুনরুৎপাদিত হয় না, তৈরি হয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও। তিনি লক্ষ করেছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণি তার আধিপত্যের শর্তগুলো তৈরি করার লক্ষ্যে এক সর্বব্যাপী সম্পর্কের সমষ্টি তৈরি করে, যার মধ্যে আধিপত্যের শর্তগুলো পুনরুৎপাদিত হয়। বুর্জোয়ারা শুধু শক্তি প্রয়োগ করেই শাসন করে না, বরং এর সাথে

www.pathagar.com

দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বও চালায়। বিপ্লবী শ্রেণির পাল্টা আধিপত্য বা হেজিমনি সৃষ্টি ছাড়া বিপ্লব হয় না। কোনো শ্রেণির হেজিমনি তৈরির জন্য তিনি তিনটি শর্তের কথা বলেছিলেন।

১. অর্থনৈতিক রূপান্তর,
২. মিত্রশ্রেণির স্বার্থের অন্তর্ভুক্তি, এবং
৩. মতাদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক উপকরণ নিয়ন্ত্রণ।

গ্রামসির মতে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের ভিতর দিয়েই শ্রেণি হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এজন্য আরো দরকার পড়ে মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। হেজিমনির হাতিয়ার হিসেবে সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষভাবে স্পষ্ট হলো গ্রামসির হাতেই। লেনিন একই কথা বলেছিলেন, তবে সেই কথাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা বোধহয় হয়ে ওঠেনি। লেনিন বলেছিলেন, হেজিমনি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির সার্বিক তৎপরতার একটি ধরন। ক্ষমতায় যাবার আগে পুঁজিবাদের সাথে সংঘাতে শ্রমিকশ্রেণি সার্বিকভাবে নেতৃত্ব সংহত করার পদক্ষেপ গ্রহণের ভেতর দিয়ে হেজিমনি অর্জন করে। আবার ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে রূপান্তরকালে ঐ হেজিমনির সহায়তায় ক্ষমতার অনুশীলন করে।

লেনিন আর গ্রামসি আলাদা কোনো কথা বলেননি, বরং গ্রামসি লেনিনের কথাই খোলাসা করে আর পরিচ্ছন্ন করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামসি এই সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব তৈরির কথা বলেছিলেন পুঁজিবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে আঘাত করার জন্যই। এই সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব তৈরি করবে কে? গ্রামসির জবাব, বিপ্লবী শ্রেণি তার নিজের বুদ্ধিজীবী তৈরি করবে, নিজের চিন্তক তৈরি করবে, যারা সমাজ-বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় পাল্টা হেজিমনি প্রতিষ্ঠায় অপরাপর শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের পরাস্ত করবে এবং নিজেদের দলভুক্ত করে নেবে।

আমাদের দেশে কোনো চিন্তা আছে যা শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব? কোনো চিন্তা আছে যা মার্ক্সের মুক্তির চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যাকে আশ্রয় করে শোষিতের সাংস্কৃতিক হেজিমনি তৈরি হতে পারে? এর উত্তর খুঁজে বের করার দায়িত্ব সবার, যারা একটা পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজ গড়তে চান আন্তরিকভাবেই, যারা পুঁজিবাদের বিশ্বকে মানুষের নিয়তি বলে মানতে নারাজ তাদেরই। এক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি লালনের দিকে।

www.pathagar.com

তাঁর দর্শন প্রকৃতই শ্রমিকের দর্শন। লালন লালন হয়ে উঠেছিলেন এবং আশ্রয় পেয়েছিলেন কুষ্টিয়ার তাঁতি সম্প্রদায়ের মধ্যে, লালনের পালক-পিতাও ছিলেন পেশায় তাঁতি। লালনের চিন্তা, গান জনপ্রিয় হয় তাঁতিদের মধ্যেই প্রথম। কোনো প্রথাগত ধর্মকে না মেনেও ধর্মের ভেতর থেকে নিজের কথা বের করে আনার বিস্ময়কর দক্ষতা লালনকে বাঙলায় এক অনন্য স্থান দিয়েছে। মানুষ, মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের মুক্তির সার্থকতার যে মার্ক্সিস্ট বয়ান, লালন তার সাথে হাত ধরাধরি করে চলেন। লালনের চিন্তা পুঁজির দার্শনিক মর্মে আঘাত করে নির্মমভাবে। বাঙালি মধ্যবিত্ত তার সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে যায় লালনের কাছেই। লালনকে ধর্মবিরোধী বলে ধর্মবাদীরাও ফেলে দিতে পারেন না। তাই বিপ্লবী শ্রেণির সাংস্কৃতিক হেজিমনি লালনকে আশ্রয় করে বিকশিত হওয়ার শর্তাবলি উপস্থিত।

বিপ্লব ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির অনুশীলনও বটে; নতুন সমাজ, মঙ্গলময় সমাজ সৃষ্টির। বিপ্লবী শ্রেণিকে এমন একটি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে হবে যা একটি বিকল্প সমাজ বিনির্মাণের উপযোগী হবে। সেই শ্রেণিকে বিকাশ-উন্মুখ নতুন সমাজের বীজ ধারণ করেই বিকশিত হতে হবে, আর সেই বীজ লালন করতে হবে একটি সক্রিয় ধনাত্মক প্রক্রিয়ায়।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা, http://bit.ly/1zV2jWp

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *জার্মান ভাবাদর্শ*, অনু. জাকের আহমেদ ও জাভেদ হুসেন, ব্রাত্যজন, কুমিল্লা, ২০০৬

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮১, মস্কো

ফরহাদ মজহার, *মোকাবিলা*

ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *বানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা*, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০২

ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, 'খ্রিষ্ট ধর্মের আদি ইতিহাস', *ধর্ম প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮১, মস্কো

বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতা কালে কালান্তরে*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা

বিনয়ভূষণ চৌধুরী, ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন ১৮২৪–১৯০০, ইতিহাস অনুসন্ধান, ৩য় খণ্ড, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৮

ভবানি সেন, 'মহা মনীষী গ্রামসি' (প্রবন্ধ); Modern Price and Other writings, Gramsci

লেনিন, *সমাজতন্ত্র ও ধর্ম*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কোলকাতা

লেনিন, 'The Attitude of the Workers' Party to Religion'

সাইয়েদ আবুল আ'লা মউদুদী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*

Anton Menger. The Right to the Whole Product of Labour

Brian P. Copenhaver, *From Kant to Croce: Modern Philosophy in Italy, 1800-1950*, Chapter: Gramsci, Introduction to Philosophy

Bukharin, N.I., *Historical Materialism: A System of Sociology*; https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1921/histmat/3.htm

Catherine A. Robinson, *Interpretations of the Bhagavad-Gita and Images of: The Song of the Lord*

Frederick Engels, *Bruno Bauer and Early Christianity*, 1882

Frederick Engels, On the History of Early Christianity, Chapter I, 1894

http://www.revolucia.ru/soc_relg.htm

Karl Marx, A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right

www.pathagar.com

Karl Marx and Fredarikh Engels, *The German Ideology*, International Publishers, New York, 1977
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Vol 1, trs. Ben Fowkes, Vintage books 1977
Karl Marx, *Early Writings,* trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton, Vintage Books, 1975, Newyork
Karl Marx, *Thesis on Foyerbakh*
Lenin, *Collected Works*, Progress Publishers, 1965, Moscow, Vol. 10
Lenin, *Collected Works*, Vol. 15, Progress Publishers, 1973, Moscow
Lenin, *Collected Works*, 4th English Edition, Vol. 29, Progress Publishers, Moscow, 1972
Lenin, *Collected Works*, Vol. 28, Progress Publishers, Moscow, 1974
Marx and Engels, 'Bruno Bauer and Early Christianity', *On Religion*, Progress Publishers, 1966
Max Weber, *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, 1905
www.marxist.org

ফুটনোট সংশোধনী

ফুটনোট ৫ : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস্, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯, পৃ. ১৫-১৬

ফুটনোট ৩৩ : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *জার্মান ভাবাদর্শ*, অনু. জাকের আহমেদ ও জাভেদ হুসেন, ব্রাত্যজন, কুমিল্লা, ২০০৬, পৃ. ১-২

ফুটনোট ৩৪ : Karl Marx & Frederick Engels, *Selected Works*, Vol. One, 'Theses On Feuerbach', 1888, p. 13-15

ফুটনোট ৩৬ : ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা : বানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা*, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০২, পৃ ১১৪

ফুটনোট ৪১-৪৪ : Karl Marx & Frederick Engels, *Selected Works*, Vol. One, 'Theses On Feuerbach', 1888, p. 13-15

ফুটনোট ৪৬ : N.I. Bukharin, *Historical Materialism: A System of Sociology*; https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1921/histmat/3.htm

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN : 978-984-92082-9-7